শিবধ্যান ব্রহ্মচারীর

অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(যোগসাধন ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রকৃত তথ্য)

মধুপুর, কাপিলমঠ হইতে

শ্রীঅবিনাশপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর দ্বারা

প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

(প্রথম মুদ্রণ ১৩১২ সাল)

প্রাপ্তিস্থান—

ম্যানেজার, কাপিলাশ্রম—পোঃ নয়াসরাই, জেলা হুগলী

এবং

ম্যানেজার, কাপিলমঠ, মধুপুর (ই, আই, আর)

মূল্য ।৶৹ আনা ; মাশুল ৴৹ আনা।

কলিকাতা

) পায় চৌধুরীর ২য় লেন, এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে

শ্রীবিহারীলাল নাথ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩৩৪। ইং ১৯২৮

সূচীপত্র।

এই পুস্তকে যে সব বিষয় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা পাঠকগণের সুবিধার্থে এই সূচীতে প্রদর্শিত হইল।

প্রকাশক।

পৃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯	২২	পোপোষ	দুঃখোষ
৯৬	২৪	জাতির্ম্মর	জাতিস্মর

শিবধ্যান ব্রহ্মচারীর অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিচয়।

বাল্যকালেই আমার পিতৃবিয়োগ হয়। যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাহাতে মাতৃঠাকুরাণীর ও আমার স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন ও আমার শিক্ষার ব্যয় চলিয়া যাইত। যখন লেখা পড়া সাঙ্গ করিয়া ওকালতী ব্যবসা করিব স্থির করিতেছিলাম এবং ওদিকে মাতৃ-ঠাকুরাণীও গৃহে বধূ লইয়া আসিয়া জীবন সার্থক করিবেন মনে করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ তিনি ভবধাম ত্যাগ করিলেন।

পৃথিবীর একমাত্র প্রিয়জনকে হারাইয়া সংসার আমার নিকট একেবারে শূন্যবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। আমার সে সময়কার মনোভাব বলিয়া পাঠকবর্গকে আর বিরক্ত করিব না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ঐ ঘটনা আমার হৃদয়কে সাধারণ অপেক্ষা কিছু বিশেষরূপে ক্লিষ্ট করিয়াছিল। তাহাতে আমার চিরশান্তির আকাঙ্ক্ষা ও জিজ্ঞাসা হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠে। আমি অনন্যমনা হইয়া বিষণ্নহৃদয়ে কয়েক মাস দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চায় যাপন করিলাম। এই সময়ে আমার সংসারে অরুচি এবং শান্তির মার্গে গমন করা স্থির-নিশ্চয় হইল।

স্বগ্রামে পরমার্থবিষয়ক আলোচনার অসুবিধা হওয়াতে স্বীয় সম্পত্তি

কতক বিক্রয় কতক বা বিতরণ করিয়া কাশীতে এক দূর-সম্পর্কীয় ব্রাহ্মণের বাটীতে আসিয়া বাসা করিলাম। ব্রাহ্মণকে ঘরভাড়া ও আহারব্যয়ের জন্য কিছু কিছু দিতাম এবং তিনিও আমাকে বেশ যত্নে রাখিয়াছিলেন।

প্রায় দুই বৎসর আমি কাশীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম। বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগ, এই তিন মোক্ষদর্শন বিশেষ-রূপে আয়ত্ত করিলাম। শাশ্বতী শান্তির দুঃসাধ্যতা ও পরম প্রভাব আমি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার সাধনেই জীবন উৎসর্গ করিব ইহা স্থির নিশ্চয় করিলাম। তজ্জন্য আমি গুরুর অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু ধীর বৈরাগ্যবান্ ও আত্মনিষ্ঠ গুরুলাভ সুলভ নহে। যত সাধু সন্ন্যাসী দেখিলাম, তাহারা প্রায়ই বাহ্যবিষয়ে রত। কোথায় বা সর্ব্বপরিগ্রহ ভোগ-ত্যাগ, আর কোথায় বা মূর্ত্তিমান্ পরিগ্রহ ও মূর্ত্তিমান্ ভোগ! যখন রেশম, শাল সুবর্ণ আদিতে ভূষিত এবং পরস্কন্ধে আরোহণ করিয়া উত্তমোত্তম আহারে পরিপুষ্ট-কলেবর 'সন্ন্যাসী' (সন্ন্যাসী অতি পবিত্র শব্দ, কিন্তু আজ কাল অনেক অসংযত ব্যক্তি এই নাম ধারণ করিয়া ইহার মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছে) দেখিতাম, তখন আমার সুসজ্জিত বানরের উপমা মনে আসিত। তাহারা কতকগুলি মেষপ্রকৃতির লোককে কবলিত করিয়া তাহাদের শোণিত শোষণপূর্ব্বক নিজের ভোগসিদ্ধি করিতেছে। আমি নিষ্কিঞ্চনভাবে অনেক স্থলে যাইয়া অনেকের প্রকৃত চরিত্রের তত্ত্ব পাই। অনেক বাহ্যত্যাগী কিন্তু অন্তরে অন্তরে লোলুপ 'সাধু' ও দেখিলাম এবং অনেক ভালমানুষ কিন্তু অবোধ লোকও দেখিলাম। কোন কোন সাধুর জীবনের কার্য্য দেখি-লাম কেবল উপদেশ করা; এক দণ্ড মনুষ্য-সঙ্গ না পাইলে তাহারা ব্যস্ত হইয়া উঠে। এই সমস্ত দেখিয়া নিম্নলিখিত পাঞ্জাবী কবিতাটী আমার মনে আসিত;—

ঘর ছোড়্‌কে কুটি বান্ধি হিলা ছোড়্‌কে ফেরি।
বাচ্চা ছোড়্‌কে চেলা কিতে মুড়্ মুড়্ মায়া ঘেরি।
চাড়া করঁা চাপাড়া করঁা করঁা দবাই বুটি।
সহজেই মহন্তী পাই হরসে প্রীত ছুটি।

অর্থাৎ "নিজ ঘর পরিত্যাগ করিয়া অন্য ঘর করে; নিজের বৃত্তি ছাড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ধনোপার্জ্জন করে; নিজ পুত্র ত্যাগ করিয়া চেলা করে; অতএব মায়া ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। মন্ত্র তন্ত্র করে, ঔষধ-পত্র করে এবং সহজেই মহন্তাই পাইয়া ভগবৎ প্রেম হইতে বিচ্যুত হয়।" অবশ্য এরূপ কোন কোন সৎ-প্রকৃতির লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা ভেক ধারণ করিয়া অনেক লোক-হিতকর বাহ্য কার্য্যে লিপ্ত আছেন, কিন্তু তজ্জন্য সন্ন্যাস-ধারণের প্রয়োজন নাই, তাহা সন্ন্যাস-ধারণের উদ্দেশ্যও নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া সন্ন্যাসের যে সমস্ত বিধি-নিয়মাদির বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার অক্ষরে অক্ষরে পালন অধুনা না হইতে পারে, কিন্তু তাহার মূল ও প্রধান প্রধান যে সমস্ত আচরণ, তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য, নচেৎ শান্তির কিছুমাত্র আশা থাকে না ও ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হয়।

এইরূপে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত সাধু সন্ন্যাসীদিগকে দেখিয়া আমি ভগ্নমনোরথ হইয়া ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ, বন, পর্ব্বত অন্বেষণ করিব, মনে করিতে লাগিলাম। একটী ঘটনায় আমার ভ্রমণ-কাল শীঘ্রই ঘটিয়া গেল। আমার বাড়ীওয়ালা ঋণগ্রস্ত হওয়াতে এক দিন আদালতের পিয়াদা আসিয়া তাহার বাটী অধিকার করিয়া বসিল। তাহাতে তাহার পরিবারের মধ্যে ক্রন্দন-রোল উঠিল; আমিও অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। মনে করিলাম, আমি যখন ভ্রমণ করিব, তখন নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভ্রমণ করাই ভাল। ইহা স্থির করিয়া আমার প্রায় সমস্ত সম্বল দিয়া বাড়ী-ওয়ালাকে সে যাত্রা উদ্ধার করিলাম। পরে গৈরিক বসন পরিধান-

পূর্ব্বক কাশী ত্যাগ করিলাম। রেলে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইয়া নিঃসম্বলে জগন্নাথাভিমুখে যাইব স্থির করিলাম। শুনিয়াছিলাম গয়ার নিকট বরাবর পর্ব্বতে অনেক সিদ্ধপুরুষ থাকেন, তাই মনে করিলাম ঐ পর্ব্বত দেখিয়া যাইব। সেখানে যাইয়া শুনিলাম যে কিছুদিন পূর্ব্বে তথায় এক মেলা বসিয়াছিল তাহাতে এক বৈরাগী আসিয়া কিছু রোজগার করিয়াছিল এবং পরেও বাহাদুরী করিয়া ঐস্থানে থাকাতে দস্যুদের দ্বারা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিল।

আমি তজ্জন্য আমার নিকট যাহা সামান্য কিছু ছিল তাহা অন্যত্র রাখিয়া 'করঞ্চোপার' নামক গুহায় বাস করিতে লাগিলাম। ঐ গুহা অশোকের সময় নির্ম্মিত। উহা এক বৃহৎ গ্রানাইট প্রস্তর খোদিত করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। গুহাগাত্র অতি মসৃণ। উক্ত মনোরম গুহায় বাস করিয়া ধ্যান ও আত্ম পরীক্ষায় রত হইলাম এবং অবসর কালে পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে খুঁজিতাম কোনও মহাপুরুষ লুকাইত হইয়া বাস করিতেছেন কিনা। শ্বাপদ দস্যু আদির ভয় অনেক আয়াসে দমন করিয়া আমি প্রায় দুইমাস তথায় বাস করিলাম। এক ক্রোশ দূরস্থ এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

এক দিন সন্ধ্যাকালে কিছু শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া তিনজন দস্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি শব্দ পাইয়া বাহিরে আসাতে তাহারা আমাকে ধরিয়া ফেলিল। পরে উরুর নীচে দুই হাত লইয়া তাহা বাঁধিয়া ফেলিল। আমাকে বদ্ধাবস্থায় গুহার দ্বারে বসাইয়া রাখিয়া তাহারা আমার ঘাসের শয্যা জ্বালাইয়া সেই আলোকে গুহার মধ্যে অর্থ খুঁজিতে লাগিল। কিছু না পাইয়া শেষে আমাকে পীড়ন করিতে লাগিল। বলিল কোথায় টাকা রাখিয়াছ, বাহির করিয়া দাও, নচেৎ টাঙ্গীর দ্বারা মাথা কাটিয়া ফেলিব।

কিছুই নাই বলাতে একজন বাহিরে টাঙ্গী আনিতে গেল। শেষ

সময় উপস্থিত জানিয়া আমি বলিলাম যে আমার মাথা কাটিবে কাট, কিন্তু আমাকে একটু ধ্যান করার সময় দাও। তাহারা উহা ভালরূপে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু আমাকে নির্ভীক দেখিয়া যেন কিছু হতভম্ব হইল। পরে একবার ভয় দেখাইয়া, একবার ভালকথা বলিয়া আমাকে টাকা বাহির করিয়া দিতে বলিতে লাগিল। শেষে আমার হস্তদ্বয় পৃষ্ঠের দিকে বাঁধিয়া বাহিরে আনিয়া আমাকে শোয়াইয়া আমার গায়ে মাথায় শুষ্ক কাষ্ঠ দিয়া আগুন ধরাইয়া দিল এবং বলিল যে টাকা বাহির করিয়া না দিলে পোড়াইয়া মারিবে।

আমি অবশ্য সমস্তই যথাসম্ভব নির্ব্বিকার ভাবে সহ্য করিতে লাগিলাম। দুইবার এইরূপ করিয়া (প্রত্যেক বারেই গায়ে আগুন লাগার উপক্রম হইলেই কাষ্ঠ সরাইয়া দিয়াছিল তাহাতে বুঝা যায় কেবল ভয় দেখানর জন্যই ঐরূপ করিতেছিল, শারীরিক পীড়া দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল না) যখন কিছুই পাইল না তখন গালাগালি দিতে দিতে সেই বদ্ধাবস্থায় আমাকে লইয়া গুহার মধ্যে শোয়াইয়া তাহারা চলিয়া গেল।

এই সময় আমার প্রকৃতই শঙ্কা হইল, কারণ সেই বদ্ধাবস্থায় শীতল প্রস্তরে সমস্ত রাত্রি থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমি একবার উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে ডাকিলাম কিন্তু কেহ ফিরিল না। পরে আমি কষ্টে ভূমি হইতে উঠিলাম এবং গুহার দ্বারের নিকট দেওয়ালের কোণ ভাঙ্গা ভাঙ্গা থাকাতে তাহাতে পৃষ্ঠস্থ হস্তের বন্ধন (গামছা দিয়া বাঁধিয়াছিল) ঘসড়াইতে লাগিলাম। তাহাতে ক্রমে উহা খুলিয়া গেল। উহারা আমার পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত অন্য সব বস্ত্র ও আসন লইয়া গিয়াছিল। আমি রাত্রিতে দক্ষিণদিকের (সুতরাং গরম) 'সাতঘরোয়া' নামক গুহায় যাইয়া তথায় সে রাত্রি কাটাইয়া প্রাতে ঐ স্থান ত্যাগ করত ভ্রমণ আরম্ভ করিলাম।

নিষ্কিঞ্চন হইয়া থাকিলেও কিরূপ বিঘ্ন ঘটিতে পারে তাহা জানাইবার জন্য ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভ্রমণারম্ভ—একজন বৈষ্ণব মহাত্মার দর্শন।

আমি 'শিবধ্যান' নামটী ভুবনেশ্বরে যাইয়া পাইয়াছিলাম। তথায় বিন্দু-সরোবরের তীরে বসিয়া একদিন উড়িষ্যার অতীত গৌরব চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় আমার পথের একজন সঙ্গী আসিয়া বলিল "ও শিবধ্যান বাবাজি, ভোজন করিবে ত এস"। সেই সঙ্গীটী কয়েক দিন আমার সঙ্গে ছিল; সে আমাকে শিবধ্যান নামে ডাকিত। সেই অবধি আমার নাম শিবধ্যান ব্রহ্মচারী হইল।

উড়িষ্যার বহু পর্ব্বত-তীর্থাদি আমি খুঁজিলাম। শুনিলাম অমুক পর্ব্বতে একজন সিদ্ধ-পুরুষ থাকেন; আমি বহু ক্লেশে তথায় যাইয়া যাহা দেখিতাম, তাহাতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রায়ই চলিয়া যাইতাম। কেবল একস্থানে এক অসাধারণ সাধু ব্যক্তিকে দেখি। উড়িষ্যার সর্ব্বোচ্চ কপিলাস বা কৈলাস পর্ব্বতের নিকট এক স্থানে এক বৈষ্ণব সাধুর সহিত দেখা হয়। তিনি এক কুটীরে থাকিতেন। আমি পথিক্লান্ত হইয়া তাঁহার কুটীরের নিকটস্থ অন্য একটী জীর্ণ কুটীরে আশ্রয় লই। তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমতঃ আমি একজন সাধারণ ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু পরে আলাপ করিয়া ও তাঁহার চর্য্যা দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলাম। তিনি অধিকাংশ সময় স্বকীয় সাধনে ব্যাপৃত থাকেন। আমি তাঁহার অসাধারণ সরলতায় মুগ্ধ হইয়া আত্ম-কাহিনী সমস্তই বলি। তাহাতে তিনিও স্বীয় বৃত্তান্ত যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যতদূর সম্ভব

তাঁহারই কথাতে বলিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এই উড়িষ্যায় ক্ষত্রিয় খণ্ডাইত কুলে জন্মগ্রহণ করি। বাল্যকাল হইতেই আমি ভগবদ্ভজনে অনুরক্ত ছিলাম। যৌবনে আমি সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজনেই জীবন উৎসর্গ করিবার মনস্থ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাই। তথায় আমার গুরুলাভ হয়। তিনি ভজন সাধনে সিদ্ধ হইবার জন্য অতিশয় উদ্যমশীল ছিলেন। তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, সমস্ত ভাবের মধ্যে মধুর বা কান্ত ভাবই শ্রেষ্ঠ। তদনুসারে আমরা ভগবান্‌কে কান্তস্বরূপ বিবেচনা করিয়া প্রেম করিবার চেষ্টা করিতাম। আমরা সদাই স্ত্রী-বেশে থাকিতাম ও স্ত্রী-ভাবের অনুকরণ করিতাম। এরূপ কিছু দিন করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু আমার ইহা অস্বাভাবিক বোধ হইত; এবং ইহাতে তত প্রীতিও হইত না। একদিন আমি গুরুদেবকে বলিলাম 'যে সাধন যত সুগম ও সরল তাহাই উপাদেয়; পুরুষ স্ত্রী-ভাব গ্রহণ করিয়া অস্বাভাবিক ভাবে সাধন করিতে গেলে কখনই তাহা শুকর হইতে পারে না। আমার ইহাতে কিছুই প্রীতি হইতেছে না'। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'তুমি সত্য বলিয়াছ, আমারও চিত্ত ইহাতে বসিতেছে না। ভগবান্‌কে কান্ত ভাবে পাইবার চেষ্টা না করিয়া বরং শ্রীমতীকে সখীভাবে ভজনা করা সুকর; আর, এক জনকে পাইলে ত দুই জনকেই মিলিবে'। ইহার পরে আমরা ভজনপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিলাম। গুরুদেব যাহা করিতেন, তাহা সর্ব্বান্তঃকরণেই করিতেন। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। কিন্তু তাহাতে আর এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। গুরুদেবের ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতে লাগিল। কারণ মধুর ভাব প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়ের তর্পণমূলক। আমাদের কুঞ্জের নিকট একজন দুর্দান্ত বাঙ্গালি বাবাজি বৈষ্ণবী সহ থাকিত। একদিন গুরুদেব ভাবে বিভোর হইয়া এরূপ কার্য্য করিয়া ফেলিলেন

যে ঐ বাবাজি তাঁহাকে বিষম প্রহারে ধরাশায়ী করিল। আমি তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনের বাহিরে একস্থানে লইয়া যাইয়া সেবা করিতে লাগিলাম। তাঁহার কটিদেশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা আর ভাল হইল না। তিনি প্রায় ছয় মাস জীবিত ছিলেন; সেই কয় মাস কেবল অনবরত 'হে হরে,' 'হে বিষ্ণো' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার নয়নযুগল গলদশ্রুতে প্রায়ই পূর্ণ থাকিত। কখন কখন তাঁহার মুখমণ্ডলে অতি অপূর্ব্ব শ্রী ও আনন্দের ভাব লক্ষিত হইত। শেষে এক দিন তিনি বলিলেন, 'মুকুন্দমুরারি, আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। বৎস, সেই পরম পুরুষকে '**পরম ঐশ্বরিক**' ভাবে ভজন করিবে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাহা কিরূপ'? তিনি বলিলেন, 'তাহার কি উপমা দিব? তাহা জগতে নিরুপম; যেমন তিনি নিরুপম, তেমনি যে ভাবে তাঁহার ভজন করিতে হইবে, তাহাও নিরুপম'। এই বলিতে বলিতে তিনি ভাবে গদগদ হইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 'তিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজমান। সকল জীবই তাঁহাকে পাইয়া রহিয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছিলেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। কেহ তাঁহাকে ক্রূরকর্ম্মা রুদ্ররূপে, কেহ তাঁহাকে কামুকরূপে, কেহ বা তাঁহাকে অন্যরূপে স্ব স্ব প্রবৃত্তির অনুযায়ী ভজনা করিয়া যথোপযুক্ত গতি পাইতেছে। তুমি সমস্ত মলিন ও দুষ্ট ভাব ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার যোগ্য, সেই **পরম ভাবে** ভজনা কর। 'সেই পরম ভাব'—এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখশ্রী অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়া প্রাণবিয়োগ হইল। আমি অতি সন্তপ্ত-হৃদয়ে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলাম।"

"পরে তাঁহার মৃত্যুকালীন কথা সকল চিন্তা করিতে লাগিলাম। পবিত্র বৈষ্ণবসমাজ যে কেন এরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও ভোগস্পৃহাতে

জর্জ্জরিত হইয়াছে, তাহার কারণ চিন্তা করিয়া আমি হতাশ্বাস হইলাম। মনে হইল, হয় ত কোন সম্যক্ বিজিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ মহোচ্ছ্বাসবশে নির্ব্বিশেষে সর্ব্বপ্রকার ভাবেই ভগবান্কে ভজনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিষয়লোলুপ ও বিচারবিহীন ব্যক্তিগণ কুপ্রবৃত্তিবশে তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া কি ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে। এইরূপ চিন্তা ও গুরুদেবের শেষের অমূল্য উপদেশ স্মরণ করিতাম। মনে করিতাম, তিনি যে ছয় মাস অনবরত হরিকে ডাকিয়াছিলেন, তাহার ফলে ভগবদনুগ্রহে তাঁহার ঐ পবিত্র জ্ঞান লাভ হইয়াছে। পরে আমি শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া যথাশক্তি ভজন করিতেছি। সমস্তই তাঁহার উপর অর্পণ।

আমি বিস্মিত হইয়া এই কাহিনী শ্রবণ করিলাম। মনে করিলাম যে সাধনপ্রণালীর দ্বারা দুই এক জন অসাধারণ ব্যক্তির কিছু অপকার হয় না, কিন্তু জনসাধারণের সমূহ অপকারের সম্ভাবনা, তাহার প্রচার সমাজের পক্ষে কি ভয়ানক কুফল উৎপাদন করে। পরে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি কি ভগবানের প্রকৃত নির্ব্বিকার স্বরূপের উপলব্ধি করিবার বিষয় চিন্তা করিয়াছেন? 'তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্' (কঠোপনিষৎ ৫।১৩। তাঁহাকে যাঁহারা আত্মাতে অবলোকন করিতে পারেন, তাঁহারাই শাশ্বতী শান্তি প্রাপ্ত হন, অপরে নহে) —ইত্যাদি শ্রুতির বিষয় কি আপনি আলোচনা করিয়াছেন?" তিনি চিন্তা করিয়া বলিলেন "না, আমি সেরূপ চিন্তা করি না। আমি তাঁহাকে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতেই অনন্যচেতা হইবার চেষ্টা করি। তাহা তাঁহার প্রকৃত রূপ না হইতে পারে, কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই আমার হৃদয়ের ভাবানুসারে যাহা স্বীয় প্রকৃত রূপ তাহাতেই প্রকাশিত হইবেন। এ বিষয়ে আমার পূর্ণ আশ্বাস আছে"।

আমি আর কিছু বলিলাম না। যাইবার সময় তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিলাম, "আপনার ন্যায় অকপট উদার বৈষ্ণব দেখি নাই। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়"।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণাপথ—ভিক্ষুকাশ্রম।

উড়িষ্যা হইতে ক্রমশঃ বালাজি, কাঞ্চিপুর প্রভৃতি তীর্থ ও অন্যান্য স্থান দেখিতে দেখিতে চলিলাম। 'সাধু'-নামধারী বহুসংখ্যক লোক ঐরূপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ বা তিনবার, কেহ বা চারিবার ভারতবর্ষ পরিক্রমণ করিয়াছে। তন্মধ্যে অনেকে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া ভ্রমণ করিতেছে। পথিমধ্যেই তাহাদের সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে। রাত্রে যখন কোন ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতাম, তখন তাহাদের কথা-বার্ত্তা আচরণাদি দেখিয়া, আমিও তাহাদের সমতুল্য অবস্থায় পড়িয়াছি বলিয়া মনে ধিক্কার হইত। কোথায় কিরূপ ভিক্ষা পাওয়া যায়, কে কিরূপ সৎকার করে, এই সমস্ত কথা এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ প্রভৃতিতে প্রায় অর্দ্ধ রাত্র বিরক্ত হইতে হইত। তাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ভিক্ষা করিয়া খাওয়া। মনে হইত যদি ঐ সকল লোক ঐরূপ ঘুরিয়া বেড়াইবার অধিকার না পাইত এবং যদি কৃষিকার্য্যাদিতে রত থাকিত, তাহা হইলে দেশের অনেক কল্যাণ হইত। বস্তুতঃ তাদৃশ অজ্ঞ, অলস, নেশাখোর এবং তজ্জনিত নানাদোষযুক্ত ব্যক্তিগণ এদেশে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রখ্যাত হওয়াই হিন্দুসমাজের অত্যবনতির প্রকৃষ্ট লক্ষণ। ভৈক্ষ-

চর্য্যার উদ্দেশ্য এদেশের ভিক্ষু ও গৃহস্থগণ অধুনা প্রায়ই জানে না। ধর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধনই ভিক্ষু-জীবনের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য তাঁহাদের নিশ্চিন্ত-জীবনবৃত্তিরূপ রাষ্ট্রপিণ্ডে বা ভিক্ষান্নে অধিকার। তাঁহারা ধর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধনপূর্ব্বক স্বকীয় দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। আর সামাজিকগণ তজ্জন্য আহার-দানে তাঁহাদের শরীর রক্ষা করেন। ইহাই ভিক্ষু ও গৃহস্থের সম্বন্ধ। কিন্তু ভিক্ষুগণ অপরিগ্রহ (জীবনধারণের অতিরিক্ত উপকরণ গ্রহণ না করা) ত্যাগ করিয়া প্রায়ই পরিপূর্ণ পরিগ্রহ-পরায়ণ হইয়াছে এবং গৃহস্থগণের মধ্যে অত্যল্প লোকই ধর্ম্মবুদ্ধিতে ভিক্ষা দেয়। এক দল গৃহস্থ আছে, যাহারা রসায়ন, কিমিয়া বা স্বর্ণ-রৌপ্য প্রস্তুত করিবার সহজ উপায়, দৈবের সহায়ে পীড়ার শান্তি প্রভৃতির আশায় সাধু-সৎকার করে এবং শেষে প্রায়ই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কপালে করাঘাত করে ও চিরকালের জন্য সমস্ত সাধুর উপর খড়্গ-হস্ত হইয়া থাকে। ঔষধের জন্যও একদল লোক সাধুসেবা করে। বৈদ্য সাধুদের প্রসার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিয়াছি। একদল সাধুভক্ত আছে, যাহারা সাধুদিগকে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন মনে করিয়া সৎকার করিয়া থাকে। তাহাতে অনেক সদুদ্দেশ্যসম্পন্ন সাধুও শেষে ভেল্কি ও বুজরুগীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার চেষ্টা করে।

অনেকে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কেবল নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন ও কেবল শব্দরাশি লইয়া বাক্যকৌশল দেখাইতেছেন। তাঁহারা লোকমনোরঞ্জিনী সুন্দর ভাষায় বক্তৃতা, বিচিত্র শব্দ যোজনা ও শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশলের দ্বারা নিজপাণ্ডিত্য দেখাইয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। এইরূপে তাঁহারা আপনাদিগকে বিষয় ও শব্দজালরূপ মহারণ্যে হারাইয়া শাস্ত্রের

প্রকৃত মর্ম্ম ও প্রত্যক্ষানুভূতির জন্য যে যত্ন করা প্রয়োজন, তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। কেহ বা হঠযোগের দুই একটা মুদ্রা-আসনাদি অভ্যাস করিয়া, কেহ বা বশীকরণ বিদ্যা (mesmerism) প্রভৃতি শিক্ষাপূর্ব্বক নানাপ্রকার বুজরুগী দেখাইয়া লোককে মুগ্ধ করিতেছে। সাধারণ ব্যক্তিগণও তাহাদিগকে যোগীশ্বর-জীবন্মুক্তাদির আসন প্রদান করিয়া উচ্চ আদর্শকে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে।

কোন কোন ব্যক্তির স্বভাবতঃ পরের মনোভাব জানিবার ক্ষমতা থাকে। ইহাদিগকে ইংরাজিতে 'থট্-রিডার' বলে। ইউরোপে তাহারা স্বীয় শক্তি দেখাইয়া বাজীকরদের ন্যায় কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করে। কিন্তু এদেশে তাহারা পরম জ্যোতিষী হয়; আর গৈরিক বসন ধারণ করিলে সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া খ্যাত হয়। অনেক সুরাপায়ী, অসচ্চরিত্র থট্-রিডার 'সিদ্ধ' আমি দেখিয়াছি, যাহারা ভেক ধারণ করিয়া শত শত অজ্ঞ (ইংরাজী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীতে প্রায় তুল্য অনুপাতে এই প্রকার অজ্ঞ লোক আছে) লোকের কষ্টার্জ্জিত বিত্ত গ্রাস করিতেছে।

কোথাও বা তপ্তকাঞ্চননিভরূপ ও সুচারুকেশকলাপযুক্ত এবং বহু ভক্তের দ্বারা পূজিত সাধু দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। মনে করিতাম এইবার বুঝি প্রকৃত বস্তু পাইলাম। কিন্তু পরিশেষে জানিয়াছি, সেই তপ্তকাঞ্চননিভরূপের কারণ পর্য্যাপ্ত মেওয়া ও মালাই আদি দ্রব্য ভক্ষণ ও বেশ-ভূষার নানাপ্রকার পারিপাট্য; আর লোককর্তৃক পূজিত হওয়ার কারণ নানাপ্রকার মজলিসী কথাবার্ত্তার পারিপাট্য।

ফলতঃ ধর্ম্মবুদ্ধিতে ভিক্ষা-দান এবং তদ্‌বুদ্ধিতে অপরিগ্রহ রক্ষাপূর্ব্বক গ্রহণ, অধুনা এদেশ হইতে একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। মঠাবাস পুরাকালে ছিল না; বুদ্ধদেব উহার সূত্রপাত করিয়া যান। কালের উপযোগী বলিয়া শঙ্করাচার্য্যও উহা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য

এবং বানপ্রস্থের কার্য্য মঠের দ্বারা একালে সিদ্ধ হয়। কারণ, এখনকার সন্ন্যাস প্রায়শঃ বিবিদিষা সন্ন্যাস *। কিন্তু অধুনা মঠের অর্থ প্রায়ই কুকর্ম্মে ব্যয়িত হয়।

এই সকল ধর্ম্মের বিপ্লব দেখিয়া কখন কখন আমি হতাশ হইয়া যাইতাম। আবার মনকে প্রবোধ দিতাম, প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সুব্রত ব্যক্তি যদি একেবারেই না থাকিবে, তবে এরূপ বহুসংখ্যক অবকীর্ণী, ভণ্ড, অযোগ্য ব্যক্তি ধার্ম্মিকতার ভানে কিরূপে এত পূজিত হইবে? গগনে প্রথম শ্রেণীর তারকার ন্যায় অবশ্যই প্রকৃত সুব্রত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইতস্ততঃ দুই এক জন থাকিবেন, যাঁহাদের নামে এই সকল ভণ্ড অব্রত-গণ পার পাইয়া যাইতেছে। এইরূপ দেখিতে দেখিতে আমি কুমারী-কন্যা বা কুমারিকা অন্তরীপে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে এক মান্দ্রাজী বণিকের সহিত সিংহলে যাইলাম। তিনি জাফনায় থাকিতেন। আমিও তথায় থাকিয়া নিকটস্থ এক বিহারে (বৌদ্ধ মঠে) পালি ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। প্রায় এক বৎসর কাল সিংহলে থাকিয়া আমি পুনরায় ভারতে আসিয়া উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। সিংহলের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে ভারতীয় ভিক্ষু অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে ভাল দেখিয়াছি।

* সন্ন্যাস দুইপ্রকার, বিদ্বৎ ও বিবিদিষা। গৃহস্থাশ্রমেই জ্ঞান লাভ করিয়া চিত্তবিশ্রান্তি-সিদ্ধ্যর্থে পুত্র-কলত্র-বিত্তাদি ত্যাগ করিয়া যে সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয়, তাহার নাম বিদ্বৎ সন্ন্যাস। আর ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভার্থ পুত্রবিত্তাদি ত্যাগপূর্ব্বক যে বৈরাগ্য-জ্ঞানাভ্যাস, তাহার নাম বিবিদিষা সন্ন্যাস।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গুরুপ্রাপ্তি।

ক্রমশঃ আমি নীলগিরিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেই স্থানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমি কিছুদিন তথায় অবস্থান করিবার মানস করিলাম। তথায় যেন চিরবসন্ত বিরাজমান। পর্ব্বতের অগম্য স্থানে কত শত পক্ক ফলভারাবনত মহীরুহ শোভিত রহিয়াছে। নানাবিধ তরুলতারাজি প্রস্ফুটিত কুসুমে শোভিত হইয়া সমধিক সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। প্রপাতবতী স্রোতস্বতী সকল মহাশব্দে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিক্ বিবিধ বিহগগণের কলধ্বনি ও কাকলীতে সদাই মুখরিত। তথাকার শিখরিমালা-পরিশোভিত দৃশ্য অতি মনোরম, এবং বায়ুও অতিশয় স্ফুর্ত্তিকর।

কোনুরের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে একটী নির্ঝরের পার্শ্বে আমি এক দিন বসিয়া আছি, এমন সময়ে কতকগুলি টোডা বা প্রদেশীয় লোক তথায় আসিয়া আমাকে কি বলিতে লাগিল। যদিও আমি 'ছত্রম্ পো' (সত্রে যাও), 'বিয়ম্' (চাউল) প্রভৃতি কতকগুলি দক্ষিণের শব্দ শিখিয়া কার্য্য চালাইতাম, কিন্তু এই পার্ব্বত্যদের ভাষা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তবে তাহাদের ভাবে বুঝিতে পারিলাম যে, তাহারা এক দিকে আমাকে যাইতে বলিতেছে। আমি সেই দিকে যাইয়া এক আশ্রম পাইলাম। তথায় দেখিলাম, পর্ব্বতগাত্রে নির্ম্মিত গুহার মত একটী প্রকোষ্ঠে এক জন সন্ন্যাসী বাস করেন। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনিও আমাকে হিন্দী ভাষায় স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। আমিও বহুদিন পরে হিন্দী ভাষা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম ও তথায় কিছু দিন বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া

তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি বলিলেন, "আমি কিছু নির্জ্জনপ্রিয়, অতএব কিছু দূরে আর একটী ঘর আছে, তুমি তথায় যাইয়া থাক"। আমি সেইরূপই করিলাম।

বহুসংখ্যক সাধু দেখিয়া এবং কাহারও মধ্যে কিছু না পাইয়া আমার ঔৎসুক্য কমিয়া গিয়াছিল। সেই কারণে এবং বাহ্যের বিশেষ কিছু অসাধারণত্ব না দেখিয়া আমি এই সাধুর বিষয়ে প্রথমে কিছুমাত্র কৌতূহলী হই নাই। কিছু দিন থাকিয়া তাঁহার চর্য্যা লক্ষ্য হওয়াতে আমার সংজ্ঞা হইল। তাঁহার ভোগ বা কঠোরতা, কোন দিকেই আড়ম্বর ছিল না। তিনি প্রায় নিয়তই আভ্যন্তরীণ কার্য্যে ব্যাপৃত বলিয়া বোধ হইত। বাহ্য বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত বিরাগও বোধ হইল। ইহাতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমি এক দিন তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম। তাহাতে আমার চেতনা হইল। মনে করিলাম, আমাদের প্রকৃত পদার্থ বুঝিবার ক্ষমতা কত অল্প। বাহ্য আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া কত স্থানে প্রতারিত হইলাম, তথাপি বোধ হয় ইহাঁর কোন বাহ্য বিশেষত্ব না দেখিয়া ইহাঁকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম। আর ইহাও মনে করিলাম যে, প্রথমে আমাদের যে ধারণা হয়, তাহা প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যাহা প্রথমে বা দূর হইতে ভাল দেখায়, তাহা পরিশেষে বা নিকট হইতে বিপরীত বোধ হয়। দূর হইতে পর্ব্বতকে কেমন কোমল ও সুচিত্র-রূপশালী দেখায়, কিন্তু নিকটে যাইলে কেবল প্রস্তর, কঙ্কর, কণ্টক প্রভৃতি লাভ হয়। যাহা হউক, তাঁহার পরিচয়ে জানিলাম যে তিনি সিন্ধুদেশীয়। তিনি ইংরাজীতে সুশিক্ষিত, সংস্কৃত শাস্ত্রের ত কথাই নাই। তাঁহার পিতা একজন বাণিজ্যব্যবসায়ী। যৌবনেই ইনি বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই মার্গাবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি যত বিষয় শিক্ষা করিয়াছি, আর কাহারও নিকট তত করি নাই।

সুতরাং তিনিই আমার গুরু। তাঁহার নিকট অনেক গভীর বিষয় শিক্ষা করিয়াছি। তাহার কিছু কিছু এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

তিনি বলিয়াছিলেন "তোমার ন্যায় আমিও এক কালে ঐরূপ সিদ্ধ পুরুষের অন্বেষণে ভ্রমণ করিয়া বিফলকাম হইয়াছিলাম। আচ্ছা, বল দেখি, জীবন্মুক্ত পুরুষগণ কেন পাহাড়ে বা বনে শত শত বৎসর লুকাইয়া বসিয়া থাকিবেন? শাস্ত্রেও বোধ হয় জীবন্মুক্তের ওরূপ লক্ষণ পড় নাই।" আমি বলিলাম "না"। তিনি বলিলেন "সাধারণ লোকে অত্যন্ত জীবনপ্রিয়, তাই স্বকল্পিত মহাপুরুষদিগের শত শত বৎসর জীবন কল্পনা করে। কিন্তু বুঝে না যে যাঁহাদের চতুর্দ্দশ ভুবন ও মোক্ষদ্বার অনাবৃত, তাঁহারা কেন এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে পড়িয়া থাকিবেন। যদি সিদ্ধসঙ্গ লাভ করিতে চাও, তবে নিজেকে তাহার উপযুক্ত কর; তাহা হইলে সর্ব্বত্রই তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইতে পারিবে। বনে বা পর্ব্বতে অন্বেষণ করিতে হইবে না। আমি এরূপ অনেক অল্পবুদ্ধি নির্বীর্য্য লোক দেখিয়াছি, যাহারা আজীবন সিদ্ধ-পুরুষের অনুসন্ধান করিতেছে এবং কত কত প্রবঞ্চকের দ্বারা প্রতারিতও হইতেছে। তুমি জান, যোগজ সিদ্ধি কতদূর দুর্লভ। বহু শতাব্দীর পর এক এক জন মহাপুরুষ যোগে কৃতকার্য্য হন। তখন তাঁহার দৃষ্টান্তে কিছু কাল আরও অনেকে তদ্বিষয়ে অল্পাধিক পরিমাণে সাফল্য লাভ করে। পরে ক্রমশঃ উহা জগৎ হইতে বিলুপ্ত হয়। আমার বিশ্বাস বর্ত্তমানে উহা লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু এ বিষয়ের কিয়ৎ পরিমাণে সমুত্থান দেখিয়া মনে হয়, কোনও প্রকৃত যোগসিদ্ধ মহাত্মার আবির্ভাবকাল বহুদূরবর্ত্তী নহে। আগামী যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীতেই প্রতিপন্ন হইবেন। কারণ পুরাকালের ন্যায় অধুনা এক দেশ ব্যতীত সমস্ত ধরা আর অশিক্ষিত

ও অনধিকারী নহে। এখন সমস্ত পৃথিবীতে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। যখন বাহ্যশক্তির আয়ামকামিগণ সমস্ত বাহ্যশক্তিকে সেই সিদ্ধ মহাপুরুষের ইচ্ছামাত্রের অধীন দেখিবে, তখন তাহারা নিজেদের জ্ঞানবিদ্যার অকিঞ্চনতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমা বিদ্যার আলোচনা করিতে প্রয়াসী হইবে। যখন বিষয়সুখকামিগণ তাঁহাকে গুরুতম দুঃখেও অবিচলিত দেখিবে, তখন তাহারা বৈষয়িক তৃপ্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা তৃপ্তি আছে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার গবেষণা করিবে। যাহা হউক, তুমি বৃথা অন্বেষণে কালক্ষেপ না করিয়া কার্য্য করিতে তৎপর হও। যাঁহাকে জ্ঞানে ও চরিত্রে নিজ অপেক্ষা উন্নত দেখিবে, তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়া কার্য্যে রত হও।"

শাস্ত্র পাঠ করিয়া ও সাধারণ পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা শুনিয়া যাহা জানিয়াছিলাম, তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া সে সমস্ত বালপ্রলাপ বলিয়া বোধ হইল। বস্তুতঃ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের মোক্ষবিষয়ক বোধে, এবং যাঁহারা মোক্ষসাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের বোধে যে কত প্রভেদ, তাহা আমি তাঁহার উপদেশের দ্বারা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। তিনি যে বিষয় বুঝাইতেন, তাহা দর্শন-বিজ্ঞানের যতদূর উচ্চ স্তরে থাকুক না কেন, তদ্বিষয়ে সমস্ত সংশয় উচ্ছিন্ন করিয়া তাহা হৃদয়ে একেবারে আহিত করিয়া দিতেন। আমি একদিন প্রশ্ন করিলাম—"সিদ্ধ পুরুষগণ যদি বনে পাহাড়ে না থাকেন, তবে আপনি কেন এই নির্জ্জন স্থানে বাস করেন?" তিনি বলিলেন "তুমি আমার কথা ভাল বুঝ নাই। লজ্জাবতী লতা যেমন স্পর্শাসহ, সেইরূপ লোকদৃষ্টির অসহিষ্ণু হইয়া সিদ্ধপুরুষগণ শত শত বৎসর বনে পর্ব্বতে লুকাইয়া থাকেন, জনসাধারণের যে এইরূপ ধারণা আছে, তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞতামূলক। বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত সিদ্ধগণের বন ও নগর উভয়ই তুল্য। তবে সাধন অবস্থায় বিজন স্থানে

থাকিয়া সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। দুষ্কার্য্য ত্যাগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু দুশ্চিন্তা ত্যাগ করা অতীব দুষ্কর। সাধকগণ বিজন স্থানে থাকিয়া হৃদয় হইতে সেই কুবাসনা সমস্ত উচ্ছিন্ন করেন এবং অহরহঃ সদ্ভাবনাকে পরিপুষ্ট করেন। ফলতঃ যাঁহারা নিজের অন্তরশুদ্ধিতে সাফল্য লাভ করিতেছেন, তাঁহারাই বিজনে থাকিতে পারেন। অন্য লোকে সে ভাবে বিজন স্থানে থাকিলে নিশ্চয়ই উন্মত্ত হইয়া যাইবে। নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরা মনে করে, বুঝি বিজন স্থানে যাইলেই সমস্ত প্রলোভন ছাড়িয়া যায়, কিন্তু তাহা নহে; তাদৃশ স্থানে অন্তর্দৃষ্টি পরায়ণ মহাত্মগণই প্রলোভনের মূলীভূত সংস্কারের সহিত প্রকৃত যুদ্ধ করেন।"

আর একদিন বলিয়াছিলেন "সম্প্রদায়ান্ধগণ অনর্থক জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ লইয়া বিবাদ করে। বস্তুতঃ ঐ তিনই এক। ভক্তি অর্থে ঈশ্বরে পরানুরক্তি। যে বিষয় সুখকর, তাহাতেই অনুরাগ হয় (সুখানুশয়ী রাগঃ—যোগসূত্র)। আর অনুরাগ হইলে সেই বিষয়েই চিত্ত লাগিয়া থাকে। তাহারই স্মরণ এবং তাহারই চিন্তন হয়। যখন অনুরাগ পরম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে, তখন সেই অনুরাগের বিষয়ে চিত্ত সদাই সংলগ্ন থাকিবে, তাহা না হইলে অনুরাগ পরম বা নিরতিশয় হইবে না। অতএব ভক্তির লক্ষণ, অনুরাগের বস্তুতে নিয়তচিত্ত থাকা। তাহাকেই যোগশাস্ত্রে সমাধি বলে। সমাধি অবস্থাতেও আর সমস্ত ভুলিয়া কেবল ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত স্থির থাকে। লোকে অবশ্য দুঃখকর বিষয়ের ধ্যান করে না; তজ্জন্য যোগীরাও পরমেষ্ট পরমাত্মারই ধ্যান করেন। সুতরাং ভক্তি ও যোগে কিছুই পার্থক্য নাই; উভয়ের ফলই অভীষ্ট বস্তুতে চিত্ত সংলগ্ন থাকা।

জ্ঞানেও বস্তুতঃ তাহাই হয়। যখন পরমাত্মাবিষয়ক বোধ উদিত থাকে, তখনই জ্ঞান আছে বলা যায় এবং তজ্জনিত শান্তি

ভোগ হয়। সেই জ্ঞান যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন জীব অজ্ঞানী হয়, এবং অশান্তি ভোগ করে। সুতরাং যখন পরমাত্মবোধ সদাই উদিত থাকিবে, সেই সময়ের জ্ঞানকেই প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলা যাইবে। ইহাকেই যোগশাস্ত্রে অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি বলে। অতএব অন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকেই সদা বোধগম্য রাখা প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ হইল।

"এইরূপে দেখা যায় যে 'অভীষ্ট বস্তুতে অনন্যচিত্ততা' ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান এই তিনেই আছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন 'সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।'

"সাধারণতঃ দেখা যায়, যাহারা কিছু স্থূলবুদ্ধি এবং দার্শনিক জ্ঞান পরিপাক করিতে পারে না, অথচ হৃদয়ের আবেগসম্পন্ন, তাহারাই ভক্ত্যভিমানী হয়। তাদৃশ স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, যাহাদের হৃদয়াবেগ কম, কিন্তু শারীরিক সংযম অধিক, তাহারাই যোগাভিমানী হয়। আর যাহাদের হৃদয়াবেগ ও শারীর সংযম কম, কিন্তু দার্শনিক বিষয় আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা আছে, তাহারা জ্ঞানাভিমানী হয়। ইহারা সকলেই অধম অধিকারী। বস্তুতঃ সদ্বিষয়ে তীব্র আবেগ, পূর্ণ শারীর সংযম ও সম্যক্ প্রজ্ঞা, এই তিন না থাকিলে কেহ ভক্ত বা যোগী বা জ্ঞানী—কিছুই হইতে পারে না—কোন মার্গেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ফলতঃ লম্ফ ঝম্প করা, বা শারীরিক সংযম করা, বা কেবল শাস্ত্রোপদেশ করা, প্রকৃত ভক্ত, বা যোগী, বা জ্ঞানীর লক্ষণ নহে।"

আর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন "আমাদের সুখ কোন প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে ঘটে। কিন্তু বাহ্য সমস্ত বস্তু বিকারশীল বলিয়া বাহ্যের প্রিয় বস্তুর সদাকালের প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। সুতরাং বাহ্যজন্য সুখ সদাস্থায়ী নহে। সুখভঙ্গের আর এক কারণ চিত্তের বিকার বা

অবস্থান্তর। প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তি ঘটিয়াছে বটে, তাহাতে কিছু কালের জন্য চিত্ত সুখীও হইল, কিন্তু পরে চিত্তের অবস্থান্তরতা প্রাপ্ত হইয়া আর সুখ হয় না, হেয়তা আসে। অতএব (১) প্রিয়তম বস্তুর প্রাপ্তি ঘটিলে, (২) সেই বস্তু অবিকারি হইলে, এবং (৩) আমাদের চিত্ত অবিকারি হইলে, তবেই নিত্য সুখলাভ হইতে পারে। সেই হেতু সমাধির দ্বারা চিত্ত নিশ্চল কর, আর অবিকারী পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ কর ও তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠবস্তূচিত পরম অনুরাগ কর, তাহা হইলে শাশ্বত সুখ লাভ করিবে।"

এইরূপে তাঁহার নিকট অনেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করিলাম। কিন্তু আমার মন মাঝে মাঝে ভ্রমণের জন্য চঞ্চল হইত। তাঁহাকে এ বিষয় বলাতে তিনি বলিলেন "অনেক দিন ভ্রমণ করাতে তোমার উহাতে সংস্কার পড়িয়া গিয়াছে; তা তুমি ভারতের অবশিষ্ট ভাগ পরিক্রমণ কর ও তৎসঙ্গে যাহা শিখিয়াছ তাহা পরিপাক কর। পরে ভ্রমণের ঔৎসুক্য নিবৃত্ত হইলে এক স্থানে বসিয়া সাধনে ব্যাপৃত হইও।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একটী অদ্ভুত গল্প ও অদ্ভুত অবতারবাদ।

ইহার পর আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া কর্ণাট, নিজাম রাজ্য, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া দ্বারকায় পৌঁছিলাম। পথিমধ্যে এমন কোন বিশেষ বিষয় জ্ঞাত হই নাই যে তাহা লিপিবদ্ধ করিব। দ্বারকায় আসিয়া একজন বাঙ্গালী সাধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নিকট একটী অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ না

করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সেই সাধুর নাম আত্মাশ্রয় অবধূত। তাঁহার পরিধানে বিবিধ উপাদানে নির্ম্মিত একটী মাত্র স্থূল কন্থা। সম্বলের মধ্যে এক কমণ্ডলু ও বৃহৎ গাঁজার কলিকা। সে আমাকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারিয়া আলাপ পরিচয় করিল। মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত দেখা হইত। লোকটা বেশ লেখা পড়া জানিত, কিন্তু গঞ্জিকা সেবনে সব গোল হইয়া গিয়াছিল। এক দিন সে আমার নিকট আসিয়া কলিকা ভরিয়া গাঁজায় খুব দম লাগাইয়া বলিতে লাগিল, "বুঝেছ বাবাজি, আমার দাদা-গুরু শ্রীশ্রীস্বপ্রকাশ অবধূত একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, বুঝেছ। ('বুঝেছ' কথাটী সে ঘন ঘন ব্যবহার করিত, সুতরাং তাহা বার বার লিখিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করিব না।) তিনি এমন এক ঘটনা দেখিয়াছিলেন যে কলিতে অতি অল্প লোকই সেরূপ দেখিয়াছে।"

আমি মনে করিলাম, কি এক গাঁজাখুরি গল্প বলিবে। লোকটার গল্প বলিবার বেশ শক্তি ছিল, অসংযুক্ত অংশ স্বকল্পনার দ্বারা বেমালুম মিলাইয়া দিত। আমার একটু আমোদ করিবার ইচ্ছা হওয়ায় বলিলাম "বটে, কি রকম দেখিয়াছিলেন?" সে বলিল "অতি অদ্ভুত! আমার গুরুদেব শ্রীনিরঞ্জন অবধূতের নিকট শুনিয়াছি। এক বর্ণও মিথ্যা নয়। আমার দাদা-গুরু (পরম গুরু) সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি দিবারাত্র সোঽহং সাধন করিতেন। একটা নিশ্বাসও ফাঁক যাইত না। সদাই আনন্দে থাকিতেন। পথে চলিবার সময় কোথায় পা ফেল্‌চেন তাহা তাঁর লক্ষ্য থাক্‌ত না, জগতের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তিনি একবার হরিয়ানা মুলুকে (দিল্লী প্রদেশে) ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে একদল বাঙ্গালী 'বৈরাগ্যাও' খোল টোল ও ঠাকুর টাকুর সহিত হরিদ্বার হইতে যমুনার তীরে তীরে বৃন্দাবনের দিকে আসিতেছিল। পথে অবধূত স্বামীর সঙ্গে তাদের

ঠাকুরের পুঁটুলির ছোঁয়াছুঁয়ি হইয়া যায়। তাতে বৈরাগীরা হল্লা করে উঠ্‌ল। হরেকৃষ্ণ গোঁসাই বলিল 'ওরে বেটা পাষণ্ড! তুই কাহে আমাদের ঠাকুরজী ছুঁলি! অভিষেকের এক ঘড়া দুধকা দাম দেও।' দাদা-গুরুজী ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাহাতে রাধাচরণ বাবাজি (সে পূর্ব্বে গড়ো গয়লা ছিল) গুরুজীকে দু এক ঘা বসাইয়া দিল। তিনি কিছুই লক্ষ্য না করিয়া চলিলেন। সখিদাস বাবাজি বলিল 'যা হবার হয়েছে। কাল প্রভুকে আধ পেটা প্রসাদ খাওয়াইয়াছি; আজ এই বিভ্রাট! সব ভাগ্যের দোষ। দেখা যাউক, আজ তিনি কি করেন।' সাধুদাস বাবাজি প্রকৃত সজ্জন ছিলেন। তিনি গুরুজীর নিকট যাইয়া বলিলেন 'মহাশয় কিছু মনে করিবেন না।' পরে রাধাচরণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন 'সবই ভগবানের ইচ্ছায় ঘটে। কে কি বেশে ভ্রমণ করিতেছে তাহা কে জানে? তুমি কেন এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিলে?'

"সেই দিন সকালে আর এক কাণ্ড হইয়াছিল। নারদজী ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য গোলোকে গিয়াছিলেন। সেখানে আম কাঁঠালের বাগান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, বারমেসে গোলোক-ভোগ আম সব পেকে রয়েছে, আর বৃন্দাবন-লীলার গরুও সব সেখানে চর্‌ছে। তাঁহার বালভোগ লাগাইবার ইচ্ছা হওয়াতে কমণ্ডলু ভরে কপিলা গরুর দুধ নিয়ে আমের সঙ্গে উত্তম করিয়া ফলাহার করিয়া নিলেন।"

এই খানে আমাকে সম্বোধন করিয়া অবধূতজী বলিল "আমাকে এক 'বৈরাগ্য' বলেছে যে, গোলোকভোগ আমের আঁটি ও খোসা থাকে না। আমার তা সত্য বোধ হয় না; কেমন?"

আমি দেখিলাম বৈরাগীদের সৌভাগ্যে অবধূতজীর কিছু ঈর্ষা হইয়াছে। বলিলাম "কৈলাসের বেলেও বিচি টিচি হয় না বোধ

হয়।" সে বলিল "হাঁ, কোথায় আম, আর কোথায় বেল। যা হ'ক, নারদজী বালভোগ লাগাইয়া "ফূর্ত্তিপূর্ব্বক ভগবান্ ও শ্রীমতীর কাছে যাইয়া বীণার ঝঙ্কার দিয়া মহাভারতের মধ্যস্থ কৃষ্ণলীলা গান করিতে লাগিলেন। আদিপর্ব্বে যে যমুনাতীরে বিহার আছে, নারদ তাহা ধরিলেন। কিরূপে অর্জ্জুনাদি পুরুষ ও স্ত্রীগণ সহ এক দিন যমুনা-তীরে সমস্ত দিন বিহার করিয়াছিলেন, সেই সব শুনাতে লাগ্‌লেন। নারদের চিরকালই গোল বাধাইবার ইচ্ছে। তাই শেষে শ্রীমতীকে সম্বোধন করিয়া বল্‌লেন 'শ্রীমতী আপনি সে দিন ছিলেন না। সে দিন বড় আনন্দের লীলা হয়েছিল।' শ্রীমতী কিছু মুখ ভারী করিয়া বলিলেন 'ঠাকুর, আজ মর্ত্ত্যে যাইয়া আমাকে সেই লীলা দেখাতে হবে।' ভগবান্ কিছু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু পরিবারের কথা কতক্ষণ ঠেল্‌বেন, শেষে বল্‌লেন 'তথাস্তু'।

আমি আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাহাতে অবধূতজী উত্তেজিত হইয়া বলিল "তুমি কি বিশ্বাস কর না? সব শাস্ত্রের কথা। মহাভারত আদিপর্ব্বের দুশো তেইশ অধ্যায় দেখ্‌লে, সব জান্‌তে পার্বে।" এই বলিয়া মাটীতে জোরে হাত চাপড়াইল। আমি বলিলাম 'হাঁ সত্য; পরে কি হ'ল তা বল।"

"তার পর ইচ্ছামাত্রেই ভগবান্ সেই যমুনাতীরে সেই রকম ঘর, তাঁবু, লোক জন, সব সৃজন করে ফেল্‌লেন। সে বার তাঁর সঙ্গে একত্র অর্জ্জুন বসেছিল, এবার স্বয়ং শ্রীমতী বস্‌লেন। এবার অর্জ্জুন ধারে বস্‌লেন। পাণ্ডবদের সব মেয়েরা এসেছিল। ঘড়া ঘড়া মদ এসেছিল। মেয়েরা সব তাই খেয়ে নাচতে গাইতে লাগ্‌ল। দ্রৌপদী সুভদ্রাও বরাসব পান করিয়া, ভাল ভাল কাপড় চোপড় তাদের বক্‌সিস্ দিতে লাগ্‌লেন। কিন্তু এসব মর্ত্ত্যলোকের অদৃশ্য ছিল।

"সেই বৈরাগীরা তার কিছু দূর দিয়া 'রাধে গোবিন্দ বল' বলিয়া

খোল করতাল বাজাইয়া যাচ্ছিল। সেই আওয়াজ শ্রীমতীর কাণে যাওয়াতে তিনি বল্লেন 'ঠাকুর, যখন মর্ত্ত্যে আসিয়াছ, তখন আজ এই ভক্তদের দেখা দাও'। অমনি বাবাজিরা সেই সব দেখ্তে পাইল। সখিদাস বলে উঠ্ল, গোঁসাইজী, আজ বোধ হয় ভাগ্য প্রসন্ন। এখানে নিশ্চয় কোন রাজা রাজড়া আছে। সেপাইদের খুসী কর্লে আজ কিছু হতে পার্বে। এমন সময় ভগবানের ইচ্ছায় এক সেপাই যেয়ে জোড় হাতে বাবাজিদের আস্তে বলিল। তারা আহ্লাদে গদ্গদ হয়ে একবারে ভগবানের সম্মুখে এল। সবাই আশ্চর্য্য হয়ে তাদের দেখ্তে লাগ্ল। সখিদাস দূরে বরাসবের ঘড়া দেখিয়া তাতে দুধ আছে ভাবিয়া মনে করিল—শুনেছিনু হরিয়ানা মুলুকে খুব দুধ, আজ তাই চোখে দেখলুম। আজ অভিষেকের নাম করে এক ঘড়া দুধ লইয়া পায়েস করিয়া প্রসাদ পাইব। গোঁসাইজী 'রাজা বাহাদুরকে' খুসী কর্বার জন্য মধুরকণ্ঠে 'জয়-দেবের বাচা বাচা গান ধরিল। গান শুনিয়া প্রথমে সকলে অবাক্ হইল। পরে কোন কোন স্ত্রীলোক মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া উঠিল। দ্রৌপদী ও সুভদ্রা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীমতী লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ বেগতিক দেখিয়া একটা আঙ্গুল তুলিলেন। অমনি বাবাজীদের মতি ফিরিয়া গেল। তারা ফের 'রাধে গোবিন্দ' ধরিল। আবার কি করিয়া বসে, এই ভাবিয়া শ্রীমতী স্বয়ং তাদের ভিক্ষা দিবার জন্য রসুই-ঘরে যাইলেন। সেখানে হরিণ বরাহ প্রভৃতি রান্না হচ্ছিল।"—আমি বাধা দিয়া বলিলাম "তুমি এসব কি বলিতেছ। শ্রীমতী, অর্জ্জুন প্রভৃতিরা পরম বৈষ্ণব। তাঁহারা ভোজন করা দূরের কথা, কখনও কি ও সব দর্শন করেন?" সে উত্তেজিত স্বরে বলিল "তুমি কিছুই শাস্ত্র জান না দেখ্ছি। জান

না বলদেব রাত দিন মদের ঘড়া নিয়ে বসে থাকতেন? আর যুধিষ্ঠির রাজা ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ কর্‌বার আগে ভাল ভাল বামুনদের হরিণ বরাহ প্রভৃতির মাংসের দ্বারা পরিতৃপ্ত-রূপে ভোজন করিয়েছিলেন। শাস্ত্র পড় সব জান্‌তে পার্‌বে। তার পর শোন, শ্রীমতী ভাল ভাল মাংস একটা সোণার থালে লইয়া অন্যান্য অনেক খাবার দাসীদের হাতে দিয়া বাবাজীদের দিতে আসিলেন। বাবাজীরা সেই থালায় মস্ত মস্ত মুড়ো ও মাংস দেখিয়া প্রথমে হতভম্ব হইয়া গেল। পরে 'রাধে রাধে' বলিয়া দৌড় দিল। শ্রীমতী অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। সকলে হাসিয়া উঠিল। ভীম শীকারে গিয়াছিল। দুটো হরিণ ও একটা বরাহ মারিয়া ঝুলাইয়া লইয়া আসিতেছিল। বাবাজীরা ছুটিয়া একেবারে তার সুমুখে পড়িল। তাহারা তাতে আরও ভয় পাইয়া অন্য দিকে দৌড় দিল। কিছু দূরে যেয়ে তবে হাঁপ ছেড়ে বাচে। সাধুদাস পুণ্যবলে ভগবানের মূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব ছটা দেখিয়া চিনিতে পারিবে পারিবে হইয়াছিল, কিন্তু সঙ্গীদের গোলযোগে বিভ্রান্ত হইয়া তাহাদের অনুরূপই কার্য্য করিল। সর্ব্বদাস বলিল 'আজ কি দুর্দ্দিন; সকাল বেলা সেই পাষণ্ড বেটার দর্শন; তার পর ঐ ম্লেচ্ছ বেটাদের দর্শন। মনে করেছিনু ঐ কাল লোকটা আর তার পরিবার দাতা লোক। শেষে কি না জাত মার্‌তে ও ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে এল।' ইহার পর বাবাজীরা বিষণ্নমনে চলিয়া গেল। কেবল সাধুদাস কোন কথা না বলিয়া বিমনা হইয়া চলিতে লাগিল। কোন প্রিয় দ্রব্য হারাইলে যেরূপ হয়, তাহার হৃদয়ও সেইরূপ বিষণ্ন হইতে লাগিল এবং নিঃসাড়ে চক্ষে জল আসিতে লাগিল। সঙ্গীদের সঙ্গ তাহার ভাল লাগিল না।

"ওদিকে শ্রীমতী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন 'ঠাকুর, তোমার এ কিরূপ লীলা?' ঠাকুর বল্‌লেন 'আজ কাল এ দেশের অধিকাংশ লোক

নিবৃত্তমাংস এবং প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন আচার-সম্পন্ন। তাই ইহারা তোমার হস্তে বরাহমাংস দেখিয়া তোমাকে ম্লেচ্ছ মনে করিয়া পলাইল। বিশেষতঃ যদিও উহারা নামে আমাদের ডাকে, কিন্তু উহারা স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও কল্পনার অনুযায়ী আমাদের আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে। তাই আমাদের প্রত্যক্ষ দেখিয়াও চিনিতে পারিল না। আমি যে সব লীলা করিয়াছি, তাহাতে কিছু কিছু দোষ থাকিলেও আমাকে সে দোষ স্পর্শ করে নাই। কিন্তু উহারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসারে সেই দোষ-ভাগেরই সমধিক চিন্তা করিয়া দূষিত হয়'।"

এইখানে আমি বাধা দিয়া বলিলাম "তুমি ঠিক বলিয়াছ। ভাগবতে রাসলীলার পর প্রশ্ন আছে যে, ভগবান্ কেন ওরূপ দূষিত আচরণ করিলেন। তাহাতে ভাগবতকার স্বীকার করিয়াছেন যে ওরূপ আচরণ দূষিত বটে, কিন্তু 'তেজীয়সাং ন দোষায়'।"

অবধূতজী স্মিতমুখে বলিল "আমি ঠিক বলেছি না ত কি বেঠিক বলেছি? আমি স্বয়ং ভগবানের কথাই বল্ছি। তার পর শোন, ইতিমধ্যে দাদা গুরুজী সেখানে আসিয়া পড়িলেন। তাঁর কিছু অগোচর ছিল না। তিনি একটা আকর্ষণ অনুভব করিয়া সেখানে আস্তে লাগলেন। তাঁকে দেখে সেকালের সব লোক বুঝতে পার্‌ল ইনি একজন প্রকৃত মহাত্মা, কেননা সেকালে সেই রকম মহাত্মাই সব ছিল। তিনি ভগবানের নিকট আসিলে ভগবান্ স্বয়ং তাঁকে লইয়া এক আসনে বসাইলেন। গুরুজী একবার ভগবানের দিকে দেখিয়া আর দেখিলেন না। নিজের ভিতরে তাঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। সকলে ঠাকুরের আচরণ দেখে তাঁর দিকে চাহিয়া রহিল। ঠাকুর শ্রীমতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 'রাধে! এই মহাত্মা আমাকে যে ভাবে দেখেন, তাহা তোমরা

কিছুই জান না। উনি আমাকে যে ভাবে পাইয়াছেন, তাহা অজর, অচল ও অবিনাশী। আর তোমরা আমাকে যে পাঞ্চভৌতিক ভাবে পাইয়াছ, তাহা বিনাশী ও বিকারী। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং' (যে আমাকে যেরূপে চায়, আমি তাহার নিকট সেইরূপেই মিলি)। তুমি পাঞ্চভৌতিক রূপ ভালবাস, তাই তোমাকে পঞ্চভূত-নির্ম্মিত গোলোক ও এই কৃষ্ণ রূপে মিলিয়াছি। কিন্তু ইহা ব্রহ্মাণ্ডলয়ের সঙ্গে লয় হইয়া যাইবে। যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে প্রকৃত আমি, এবং যেখানে প্রকৃত আমি, সেখানে ধর্ম্ম জানিবে। কিন্তু যেখানে আমার পাঞ্চভৌতিকরূপ, সেখানে ধর্ম্ম না থাকিতেও পারে। দেখ, যদুকুলে আমার এই রূপ থাকিলেও কিছুই ধর্ম্ম ছিল না। আমার পার্থিব জীবন-কাল যেমন পার্থিব নিয়মের বশীভূত ছিল, পৃথিবীতে আমি যে কারণে লীলা চিরস্থায়ী রাখি নাই, স্বর্গেও সেই কারণে রাখিব না। স্বর্গ সমস্তও লয় হইবে, কারণ তাহাও রূপ-রসাদি ভূত-নির্ম্মিত। কিন্তু আমাকে এই মাহাত্মা যে ভাবে পাইয়াছেন, তাহা ইন্দ্রিয়াতীত, সুতরাং অবিনাশী।" রাধা কিছু বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, 'কেন ঠাকুর? বেদব্যাস আমাকে বলিয়াছেন 'যেমন আকাশ নিত্য, কাল নিত্য, তেমনি গোলোকও নিত্য।" ভগবান্ বলিলেন 'বেদব্যাস তোমার মনো-বিনোদন করিয়াছেন। দেশ ও কাল নিত্য নহে। তাহারাও আমা হইতে বিকসিত হয়; কারণ দেশ ও কাল আমার আধার নহে, আমিই তাহাদের আধার। আমিই সকলের মূলাধার। অজ্ঞ লোকেরাই মনে করে, আমি দেশ ও কালের মধ্যে আছি। কিন্তু দেশ ও কাল কিরূপে আমার ভিতর আছে, তাহা তাহারা বুঝে না।'

ভগবান্ পুনশ্চ বলিলেন 'রাধে! তুমি বিষণ্ণ হইও না। তুমি পরিশেষে আমার সেই পরম রূপেই যাইবে। আমি তোমার প্রীতির

জন্যই এই গোলোক সৃজন করিয়াছি। আমার ইহাতে কিছুই ইষ্টানিষ্ট নাই, কারণ আমি অনাদি কাল হইতে এরূপ অসংখ্য গোলোক ভোগ করিয়াছি এবং ইচ্ছামাত্র বর্ত্তমানেও এরূপ অসংখ্য গোলোক ভোগ করিতে পারি। অতএব তোমাকে এই মহৎ ঐশ্বর্য্য ভোগ করাইবার জন্যই এই গোলোক সৃজন করিয়াছি। রাধে! তোমার অনুরাগ উত্তম বটে, কিন্তু চরম নহে; কারণ, তুমি কেবলমাত্র আমাকে চাও না, এই গোলোকের ঐশ্বর্য্যের সহিত আমাকে চাও। গোলোকের ঐশ্বর্য্যেও যখন তোমার অরুচি হইবে, তখন তুমি এই গোলোক ভুলিয়া কেবল আমাকেই দেখিবে। এখন তুমি চারিদিকে আমাকে দেখ, কিন্তু চরমে আর চারিদিক্ দেখিবে না, দিক্ বিদিকের ভাব ভুলিয়া কেবল একমাত্র আমাকেই দেখিবে। তাহাই অচঞ্চল শ্রেষ্ঠ ভাব, কারণ, চারিদিক্ ফিরিয়া চারিদিকে আমাকে দেখিলে সে ভাবেও চঞ্চলতা থাকে। চরম ভাবে চারিদিকেও ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। যখন তুমি আমাকে এইরূপ দেখিবে, তখন আর তোমার পৃথকৃত্ব থাকিবে না, আমার ভিতরেই তোমার সত্তা আসিবে। তখন আমি যে শাশ্বতী শান্তি ভোগ করিতেছি, বেদ ও গীতাদিতে আমি যাহার উপদেশ করিয়াছি, তুমিও আমার এই বাহ্য ভৌতিক রূপ ত্যাগ করিয়া সেই পরম রূপ সাক্ষাৎ করিয়া তাহাতেই থাকিবে।

ইহা শুনিয়া শ্রীমতী স্বয়ং ভাল ভাল লাড্ডু পেড়া লইয়া গুরুজীকে খাওয়াইলেন, বরাহের মুড়া টুড়া আর আনিলেন না, আনিলেও দোষ ছিল না।"

আমি বলিলাম "তোমাদের মাংসাদি চলে নাকি?" সে বলিল, "আরে না না। আমার সঙ্গে আর তাঁর সঙ্গে তুলনা হয়? আমার গুরুর হুকুম যখন তিন দিন না খেতে পেলে কিছুমাত্রও তোমার

মনের বিকার হবে না, তখন তোমার ভক্ষ্য অভক্ষ্যের কিছু বিচার করিবার দরকার হবে না।' এখন একবেলা না খেতে পেলে প্রাণ যায় যায় হয়, অতএব এখন পূরা বিচার করা উচিত। তার পর শোন—গুরুজী সেখানেই ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। সন্ধ্যার সময় ভগবান্ অন্তর্দ্ধান হইলেন। আমি সেই গুরুর নাতি, বুঝেছ, ব্রহ্মচারীজী।"

কথন চলিত ভাষায়, কথন বা শুদ্ধ ভাষায় সে এই গল্প বলিল। আমি শুনিয়া কি ভাবিব, সহসা স্থির করিতে পারিলাম না। তাকে বলিলাম "তুমি এই গাঁজার কলিকা সেই দাদা-গুরুর নিকট পাইয়াছ নাকি?" সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "তুমি খুব ঠাট্টা শিখিয়াছ। তাঁরা কি এ সব করিতেন?"

আমি কোমলভাবে বলিলাম "তবে তুমি এরূপ জ্ঞানবান্ হইয়া কেন গাঁজা ধরিয়াছ?" সে বলিল "নানা দেশের জল বরদাস্ত করবার জন্য ওটা হয়ে গেছে।"

আমি বলিলাম "ও ওজর আমি অনেক শুনিয়াছি। আমি এত দেশ ঘুরিলাম, আমার ত কিছুই আবশ্যক হইল না।"

সে বলিল "যো হো গয়া, সো হো গয়া, এখন চল, মাধোদাস করসণ দাসদের ওখানে ভোজ আছে।" পরে খুব হাসিতে হাসিতে বলিল "আমি এক গাঁজার স্তোত্র রচনা করিয়াছি। শোন বল্‌ছি—

"গাঁজা চ গঞ্জিকা গাঞ্জা ত্বরিতানন্দদায়িনী।
উচ্যতে প্রাকৃতৈর্গেঁজা ইতি তে নামপঞ্চকম্॥ ১॥
সন্তঃপোপৌঘসংহন্ত্রী সন্তশ্চিন্তাবিনাশিনী।
সুখদা ধ্যানদা গাঁজা গাঁজৈব পরমা গতিঃ॥ ২॥
সংসারাসক্তচিত্তানাং সাধূনাং গঞ্জিকে সদা।
দুশ্চিন্তাবিস্মৃতের্হেতুঃ ত্বং হি লক্ষ্মীবিরোধিনী॥ ৩॥

অভূৎ পক্ষী প্রসাদাত্তে রূপচাঁদো জরায়ুজঃ।
ইতি তে মহতী শক্তিঃ বঙ্গেষু পরিবিশ্রুতা॥ ৪ ॥
ত্বদ্ধূমরসিকা গাঁজে কদাপি ত্বাং ত্যজন্তি ন।
যতো মহীতলে কো হি ধীমান্ বা শূর এব বা।
আয়ুষ্কালে জহার ত্বাং পীত্বা ধূমামৃতং সকৃৎ॥ ৫ ॥
ধ্যানাবধানার্থ নিমীলিতাক্ষঃ যোগীন্দ্রশম্ভুস্ত্বিতি ভাষতেঽজ্ঞঃ।
গাজামদোক্তাং চরসান্বিতাঞ্চ সংসেব্য চান্তে বিজয়াং তথাসৌ॥ ৬॥
গাঁজাখোরাঽথ গেঁজেল ইতি ভক্তক্রমো মতঃ।
দ্বোকদম-স্ততশ্চান্যঃ বহুদমো মতোঽপরঃ॥ ৭ ॥
ইতি বৃহৎকলিকক্বতং গঞ্জিকাস্তোত্রম্।"

ইহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে আমার পেটে খিল ধরিয়া গেল। সেও হাসিতে লাগিল। পরে আমি তাহার নিকট হইতে ইহা লিখিয়া লইয়াছিলাম। পথে যাইতে যাইতে আমি দ্বারকায় কৃষ্ণ-লীলার কথা উত্থাপন করাতে সে আর এক অদ্ভুত মত বলিল। আমাদের ভারতভূমি অধুনা ভাল মন্দ (মন্দের ভাগই অধিক) অশেষপ্রকার ধর্ম্ম-মতের আকর, আর অবতারও অসংখ্য। কিন্তু তাদৃশ অবতারবাদ আমি আর কোথাও শুনি নাই। সে বলিল "বুঝেছ ব্রহ্মচারীজি, তোমরা যে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার বলিয়া জান, উহারা কেহই আসল অবতার নহেন। সিদ্ধ পুরুষের কাছে যা শুনিয়াছি তা অপূর্ব্ব। রামাদিরা সব মানুষ। তাঁহারা ভগবান্‌কে সোঽহংভাবে সাধন করিয়া শেষে 'অহং বিষ্ণুঃ' 'অহং শিবঃ' এইরূপে নিজেদের ভগবান্ বলিয়া জানিয়া গিয়াছেন। তাহাতেই অজ্ঞানীরা তাঁহাদিগকে প্রকৃত ভগবানের অবতার মনে করে। বিষ্ণুপুরাণে বলে, কৃষ্ণ সেই মহাবিষ্ণুর এক কেশাগ্রের সহস্রাংশের এক ভাগ মাত্র। ভগবানের পূর্ণ অবতার যেরূপ হবে, তা তোমরা কিছুই

জান না। সে অতি গূঢ় কথা, সিদ্ধ মহাত্মাদের নিকট শুনিয়াছি।” আমি বলিলাম “তা আমাকেও বল না।” সে বলিল, “বলিতে পারি, কিন্তু তুমি হয়ত বিশ্বাস করিবে না। পূর্ণ ভগবানের অবতার কিরূপে হইবে, তা শুন। সেই সময় পৃথিবীময় প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আকাশ হইতে এক এক জ্যোতি নাবিয়া আসিবে। সব লোক যখন তাহা স্তম্ভিত হয়ে দেখ্‌তে থাকবে, তখন তাহার ভিতর হইতে এক এক জ্যোতির্ম্ময় রূপ বাহির হইবে। তোমাদের মানুষ অবতারদের জন্ম ও অবতারত্ব লইয়া যেমন লোকে সংশয় করে, কেহ মানে কেহ বা মানে না। পূর্ণ ভগবানের ঐরূপ হবে না। তাঁহার অবতারত্বে কাহারও কোন সংশয় থাকিবে না। তোমাদের অবতারেরা যেমন কোন কোন কাজ নানা কৌশলে করিয়াছেন, কোনটা বা করিতেও পারেন নাই, তাঁহার সেরূপ হইবে না। পূর্ণ ভগবানের পূর্ণ ইচ্ছা-শক্তি ; তিনি যখনই যা ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ হয়। পাপীদিগকে তাঁহার চক্রের দ্বারায় কাটিতে বা ত্রিশূলের দ্বারা খোঁচা দিতে হয় না। তিনি বলিবেন, ‘তোমরা সব ধার্ম্মিক হও,’ অমনি ইচ্ছা-মাত্রেই তৎক্ষণাৎ সব লোকে ধার্ম্মিক হইয়া যাইবে। তোমাদের অবতারকে কেহ মানে, কেহ মানে না। কিন্তু সেই অবতারকে সকলেই মান্‌বে। কারণ ভগবানের ইচ্ছাশক্তি অব্যর্থ, তিনি যদি ক্ষণেকের জন্য মনে করেন যে সকলে আমার এই অবতার মানুক,” তবে কাহারও তাঁহাকে না মানিবার শক্তি থাকিবে না। পৃথিবীতে আর মতদ্বৈধ থাকিবে না। তাঁর পূর্ণ মহিমা প্রকাশ পাইবে। বুঝেছ ব্রহ্মচারীজি! তাঁহার নাম হবে ‘স্মামোক্ষ’।” আমি অনেক কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া বলিলাম “ইহা গঞ্জিকা-পুরাণে আছে নাকি?” সে চটিয়া বলিল, “আমি জানি তোমরা

এসব বুঝ্‌তে পার্‌বে না।” এই সময়ে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হওয়াতে আর কোন কথা হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুচিন্তন—উত্তরাখণ্ড।

পূর্ব্বোক্ত দুইটা গল্প আমার মনে কিছু গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। পরে ভাবিতে লাগিলাম যে, গল্পদুটীতে শিখিবার অনেক বিষয় আছে। আমরা ভগবান্ সম্বন্ধে প্রায়ই নিজেদের সংকীর্ণ জ্ঞানের দ্বারা এরূপ সংকীর্ণ ধারণা করি যে, হয়ত প্রকৃত ভগবানের সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহাকে চিনিতে পারি না। কতগুলি কবিকাহিনী ও বিকৃতভাবে অঙ্কিত ছবি বা স্থূল নিষ্প্রভিভ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া অনেকের ভগবানের ধারণা হয়। দুই ঋষির মধ্যে কোন বিষয় লইয়া বিবাদ হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহারা তপস্যা করিয়া বিষ্ণুকে সাক্ষাৎকার করিয়া মধ্যস্থ মানেন। বিষ্ণু একের পক্ষ যথার্থ বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাহাতে অন্য ঋষি বলিলেন “উনি কখনই বিষ্ণু নন, কোন দানব তোমার মোহ উৎপাদন করিবার জন্য বিষ্ণুরূপে আসিয়াছিলেন।” এই-রূপে আমরা প্রায় আপনাদিগকে বা স্বসম্প্রদায়স্থ লোকদিগকে বা আমাদের সম-ধর্ম্মাবলম্বিগণকেই ভগবানের একমাত্র প্রিয় মনে করি, এবং ভিন্নমতাবলম্বীদেরকে ভগবানের পরিত্যক্তও মনে করি। বুঝি না যে তিনি যেমন আমাদের, তেমনি তিনি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের—অসংখ্য প্রাণীর। ভাবি না—

> ‘সমা সর্ব্বত্র ভা ভানোঃ সমা বৃষ্টিঃ পয়োমুচঃ।
> সমা ভগবতঃ কৃপা সর্ব্বভূতানুকম্পিনী॥’

আর তাহার অবতারের গল্পে মনে করিলাম যে সে গাঁজা-খোর হইলেও ভগবানের পূর্ণ শক্তি সম্বন্ধে অনেক আধুনিক অবতারবাদী পণ্ডিত অপেক্ষা অধিক বুঝিয়াছে। প্রচলিত অনেক অবতার অপেক্ষা তাহার অবতার ঐশ্বরিক ভাবের সহিত অধিক সামঞ্জস্যযুক্ত। এদেশে কাহারও কিছু অসাধারণ শক্তি হইলেই তাহার ভক্তগণ তাহাকে অবতার বানাইয়া দেয়। যাহাকে পূর্ণ অবতারের পদে বসাইতেছে, তাহাতে হয়ত পূর্ণ ঐশ্বরিক শক্তির অনেক অভাব। এক চাষা রাজধানী দেখিয়া আসিয়া বন্ধুদের নিকট গল্প করিয়াছিল যে "নগরে রাজা দেখিয়াছি, সে রূপার থালিতে সোণার চিঁড়া খাচ্ছিল"। অনেক অবতারের কল্পনাও এইরূপ।

গুজরাট ত্যাগ করিয়া আমি মালব দেশ, রাজবাড়া ও পাঞ্জাবের কিয়দংশ ভ্রমণ করিয়া প্রায় তিন বৎসর পরে চৈত্র মাসে হরিদ্বারে পৌঁছিলাম। তথা হইতে হিমালয় ভ্রমণ করিবার মানস করিলাম। হরিদ্বারে আমার কাশীর সেই বাড়ীওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সপরিবারে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি আমাকে কাশী লইয়া যাইবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আমি কিছুতেই স্বীকার না হওয়ায়, শেষে কিছু অর্থ দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি অগত্যা লইলাম, এবং চিন্তা করিয়া তাহা রাখিয়া দিলাম; কারণ আমি ভোট বা তিব্বতে যাইব বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলাম। আমি ভ্রমণকালে কাহারও নিকট অর্থ ভিক্ষা করি নাই। তবে অযাচিত হইয়া কখন কখন কিছু পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহা কখনও দু এক দিনের অধিক সঞ্চিত রাখি নাই। এই আমার প্রথম অর্থসঞ্চয়।

বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই আমি হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিলাম। ভ্রমণ করিয়া আমার শরীর অতিশয় দৃঢ় হইয়াছিল। তাহাতে আমি সবীর্য্যে চলিতে লাগিলাম। দুই মাসের মধ্যেই কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী আদি দর্শন শেষ করিয়া ফেলিলাম। গাড়োবাল হইতে ভোটে (তিব্বতে) যাইবার কয়েকটি পথ আছে। গ্রীষ্মকালে ভুটিয়াগণ ঐ সকল পথে ব্যবসায়ার্থ দলে দলে পশ্বাদি সহ আইসে; এবং শীতের পূর্ব্বে পুনরায় প্রস্থান করে। আমি একদল ভুটিয়ার কাফিলার সহিত মিলিয়া ভোটে যাওয়া স্থির করিলাম। তাহারা আষাঢ় মাসেই যাত্রা করিল। কোন্ পথ দিয়া আমি গিয়াছিলাম, তাহা বলিব না। কেন বলিব না, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে। আমাদের দলের ভুটিয়াদের দুই জন বা তিন জনের এক একটি স্ত্রী ছিল *। গরু, ছাগল প্রভৃতির পৃষ্ঠে পণ্যসম্ভার বোঝাই করিয়া তাহারা যাইতেছিল। কয়েক দিন যাইবার পর একজন ভুটিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। সে দু এক দিন অতি-কষ্টে চমরীর পৃষ্ঠে যাইল, পরে একদিন একস্থানে শুইয়া সে আর চমরীর পৃষ্ঠে উঠিতে চাহিল না। তাহার সঙ্গিগণ তাহাকে অনেক বুঝাইল; কিন্তু সে 'মরিয়া' হইয়া কিছুতেই আর চমরীতে উঠিতে চাহিল না। তাহার সঙ্গিগণ কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়া শেষ তাহাকে ফেলিয়া যাওয়া স্থির করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল। আমি দেখিলাম, তাহার রোগ মারাত্মক নহে। কিন্তু তাহাকে ফেলিয়া গেলে সে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে। ইহা ভাবিয়া, কোন ক্রমে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন

* তিব্বতদেশে এখনও এইরূপ প্রথা (polyandry বা এক স্ত্রীলোকের বহু স্বামী থাকা) প্রচলিত আছে।

হইল না। আমি বলিলাম, আমি উহার সহিত থাকিব। তাহারা কিছু আশ্চর্য্য হইল এবং ঐ ব্যক্তির পশু, আহার্য্য ও অন্যান্য কতক দ্রব্যাদি পৃথক্ করিতে লাগিল। রুগ্ন ব্যক্তির স্ত্রী বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাহার নিকট বসিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র উঠিবার জন্য তাড়া দিতেছিল। এমন সময় আমি রোগীর নিকট যাইয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম "আমি তোমার নিকট থাকিব। তুমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবে।" (বলা বাহুল্য—ইহারা কিছু কিছু হিন্দী জানিত) আমি তাহার স্ত্রীকেও থাকিতে বলিলাম। বোধ হইল রুগ্ন-স্বামী তাহার অধিকতর প্রিয় ছিল। সে স্বভাষায় উত্তেজিত স্বরে দ্বিতীয় স্বামীর সহিত কথা বলিতে লাগিল। শেষে তাহারা উভয়েই থাকা স্থির করিয়া আপনাদের দ্রব্যাদি পৃথক্ করিয়া লইল। পরে কাফিলা চলিয়া গেল।

সেই স্থানটি একটি 'পড়াও' বা যাত্রীদিগের বিশ্রামস্থান। পর্ব্বত-গাত্রস্থ পথ সেখানে কিছু বিস্তৃত ও সমতল। সেখানে কয়েকটি স্বাভাবিক কন্দরও ছিল, কিন্তু সেগুলি ছাগল-নাদিতে অপরিষ্কৃত ছিল। তাহারই একটা পরিষ্কার করিয়া রোগীকে তন্মধ্যে রাখিলাম। আমার সঙ্গে দু একটা ঔষধ ছিল। রোগীর বিশ্বাসের জন্য তাহাকে কিছু ঔষধ খাওয়াইয়া দিলাম। সে স্থানে কোন বৃক্ষাদি ছিল না, তবে প্রায় এক মাইল নিম্নের উপত্যকায় কিছু কিছু গাছপালা ছিল। আমি সেই ভুটিয়াকে লইয়া তথা হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্য যাইলাম। কাষ্ঠসংগ্রহ করিতে করিতে সেই স্থানে কয়েকটা মিঠা বিষের (Aconite) বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই আমার মনে হইল, ভুটিয়ার যে রোগ, তাহাতে উহা মহৌষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

আমি হস্তস্থ লৌহাগ্র যষ্টির দ্বারা তাহার মূল খনন করিয়া লইলাম। ঐ ঔষধে এবং প্রধানতঃ বিশ্রামে রোগীর বেশ উপকার হইল। সে আমার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইল। তাহার একটা দুগ্ধবতী চমরী ছিল; সে তাহার দুগ্ধ আমাকে দিত। ঐ দুগ্ধ অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ এবং গন্ধযুক্ত। আমি তাহাদিগকে বুদ্ধের জীবনী শুনাইতাম। তাহারা অতি ভক্তি সহকারে শুনিত। বুদ্ধকে তাহারা শাক্য থুবপা বলে।

আমি তাহাদিগকে তিব্বতের লামাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতাম। কোন অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন লামা আছেন কি না জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা অনেকের নাম করিল, কিন্তু বলিল সেখানে আমাকে যাইতে দিবে না; তবে লাডাকের দিকে একজন সিদ্ধ লামা থাকেন তথায় আমি যাইতে পারি। সিদ্ধ লামাদের প্রাচুর্য্য শুনিয়া এবং সঙ্গীদের অজ্ঞতা জানিয়া, তাহাদের কথা কতদূর প্রকৃত তাহা আমি বুঝিয়া লইলাম। আমার অলৌকিক বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়া রোগী (যে এখন প্রায় সুস্থ হইয়াছিল) বলিল যে ঐ স্থানের নিকটেই এক আশ্চর্য্য 'দেবপুরী' আছে। তাহারা একবার পশু চরাইতে আসিয়া এই 'পড়াওয়ে' অনেক দিন ছিল। সেই সময় সে একবার তথাকার এক উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করে। সেখান হইতে সেই স্থান সে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। যে স্থানে আমরা ছিলাম, তাহার নিকটে অনেক চির-তুষারক্ষেত্র (glacier)-মণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী ছিল। আমি মনে করিলাম, সে সেই হিমানীর ভিতর কোনপ্রকার ধাঁধাঁ দেখিয়া থাকিবে এবং তাহাকেও তাহা বলিলাম। কিন্তু সে পুনশ্চ যেরূপ বলিল তাহাতে আমার কৌতূহল অত্যন্ত উদ্দীপিত হইল। কোথা হইতে দেখিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করাতে, সে অদূরবর্ত্তি এক উচ্চ শৃঙ্গ দেখাইয়া দিল। সে সময় রাত্রে ঐ শৃঙ্গে 'য়োঁ' বা কণিকাতুষার (Snow) পড়িত ও দিনের বেলায় গলিয়া যাইত। আমি তাহাকে বলিলাম "আমি

কালই উহার উপর উঠিব" এবং কোন্ দিক্ দিয়া উঠা সুবিধাজনক হইবে, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম।

পরদিন প্রত্যুষে আমি ছাগল-নাদির অগ্নিতে একখানি বৃহৎ রুটি প্রস্তুত করিয়া লইলাম। পরে কিছু দুগ্ধ পান করিয়া সেই রুটিখানি সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলাম। বহুকষ্টে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রায় এগারটার সময় আমি সেই শৃঙ্গের শিখরদেশে পৌঁছিলাম। গলিত তুষারে পর্ব্বত-গাত্র অতিশয় পিচ্ছিল হইয়াছিল এবং তথায় মর্ম্মচ্ছেদী শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। যদিও সেখানে আষাঢ় মাসে সূর্য্য মাথার উপর থাকে না, তথাপি আকাশ অতি নির্ম্মল ও স্বচ্ছ থাকাতে রৌদ্র খুব তীব্র ছিল। কিন্তু তথাপি আমার শীত করিতে লাগিল।

সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে এক প্রস্তরের আড়ে বসিয়া আমি যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা বোধ হয় আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ভুটিয়ার কথায় আমার অর্দ্ধবিশ্বাস হইয়াছিল, কিন্তু তখন যাহা দেখিলাম, তাহাতে একেবারে বিস্মিত হইয়া যাইলাম। দেখিলাম সোজাসুজী প্রায় বিশ পঁচিশ মাইল দূরে (যদিও পার্ব্বত্যপ্রদেশে দূরতা ঠিক করা অতি কঠিন, তথাপি তাহাতে আমার বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল) চতুর্দ্দিকে চিরতুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত এক বিস্তৃত চক্রাকার ভূভাগ। আমি যেদিক্ হইতে দেখিতেছিলাম সেই দিকে কেবল কতকাংশে তত বেশী উচ্চ শৃঙ্গ ছিল না। সেই ভূভাগের মধ্যে এক কৃত্রিম 'মন্দির' (অন্য কোন নাম না পাওয়াতে "মন্দির' শব্দ ব্যবহার করিলাম) দেখিতে পাইলাম। তাহা স্তবকে স্তবকে নির্ম্মিত; প্রত্যেক স্তবকই ভিন্ন বর্ণের। তাহার আয়তন এরূপ বৃহৎ যে তত দূর হইতেও আমি সমস্ত স্তবক স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারিলাম। মন্দির বা হর্ম্ম্যটি এক প্রাগ্‌ভারের (উচ্চ স্থানের) উপর স্থিত এবং তাহা বৃহৎ জলাশয় ও উপবনে পরিবেষ্টিত বোধ হইল। আমার এক ক্ষুদ্র ঝুলিতে কয়েকটা

আবশ্যকীয় দ্রব্যের সহিত দুইখানি কাচ ছিল। একখানি বেশী concave আকৃতিবিশিষ্ট ও অন্যটী কিছু convex। দুইখানি দিয়া উপযুক্ত-ভাবে দেখিলে দূরস্থ দ্রব্য প্রায় চারি পাঁচ গুণ বড় দেখাইত। তাহা দিয়া আমি বিশেষরূপে দেখাতে, যেন গবাক্ষশ্রেণী দেখিতে পাইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভয়ানক যাত্রা।

উহা দেখিয়া প্রথমে আমি মনে করিয়াছিলাম, উহা কোনপ্রকার স্বাভাবিক বস্তু বা মরীচিকা হইবে। কারণ ওরূপ অগম্য স্থানে মানবের কীর্ত্তি থাকিতে পারে না। পরে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করাতে উহা কৃত্রিম বলিয়া নিশ্চয় হইল। তখন আমার মনে কত কি ভাবের উদয় হইতে লাগিল। মনে হইল বোধ হয় উহা পুরাকালের কোন মহতী কীর্ত্তি, অথবা গন্ধর্ব্ব নগর, অথবা পৌরাণিক আখ্যায়িকা যাহা শুনা যায় তাহারই বা কিছু হইবে। সেই পর্ব্বতাগ্রে বসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া, সমস্ত জগৎ যেন বিস্মৃত হইয়া, কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে হইল হয়ত উহা কোন বিবিক্ত জনপদ; অথবা হয়ত ওখানে কোন মহাপুরুষ আছেন। এই সকল চিন্তা করিয়া শেষে সেখানে যাওয়া যায় কি না, তাহা দেখিতে লাগিলাম। যেখানে সেই তুষার-মণ্ডিত শৈল-প্রাবৃতি ছিল না, তথাকার এক অনুন্নত ত্রিচূড় পর্ব্বত আমি বিশেষরূপে স্মারক পুস্তকে অঙ্কিত করিয়া লইলাম। পরে সেই ত্রিচূড় পর্ব্বতাবধি নিম্ন উপত্যকা-রেখা কোন্ দিকে গিয়াছে তাহারও আনুমানিক ভূচিত্র করিয়া লইলাম। শেষে মনে হইল, চেষ্টা করিলে হয়ত ওখানে যাইতে পারিব। পর্ব্বতাগ্র হইতে দূর স্থান

দেখিতে যেরূপ সুগম বোধ হয়, কিন্তু তথায় যাইবার সময় যেরূপ দুর্গম বোধ হয়, তাহা আমি বিশেষরূপে জানিতাম। বিশেষতঃ তথায় হিম-শিলা ও তুষার-ক্ষেত্রের যেরূপ প্রাচুর্য্য, তাহাতে যে গমন করা অতীব কঠিন হইবে তাহাও আমি বিশেষরূপে বুঝিলাম। কিন্তু আমি এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে তথায় যাওয়াই স্থির করিলাম। মনে হইল, আমার কেহই ত কাঁদিবার নাই; আর ইহ জীবনে কি বা সুখ, হয়ত পর জীবনে অধিক সুখে থাকিব; অতএব ঐ স্থানে যাইতে যদি প্রাণ-পাতও হয় তবে বিশেষ ক্ষতি কি? আর যদি ওখানে যাইতে পারি, তবে নিশ্চয়ই কোন অপূর্ব্ব অভ্যুদয় ঘটিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিশেষরূপে একবার সম্ভবপর পথ দেখিয়া লইলাম। পরে যাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসনে আসিলাম। একবার মনে হইল, সম্ভবতঃ এই যাত্রায় মহাপ্রস্থান হইবে, হয়ত শরীরটা হিমানীতে রক্ষিত হইয়া থাকিবে ও যুগ-যুগান্তরে হয়ত কেহ তাহা দেখিতে পাইবে !!

আসনে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, ভুটিয়ারা উৎকণ্ঠিত হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা বলিলাম। পরে, আমি তথায় যাইবার মানস করিয়াছি ইহা বলাতে তাহারা অবাক্ হইয়া গেল। ইহা শুনিয়া রোগী বলিল 'না কাশীলামা (তাহারা আমাকে কাশীলামা বলিত), ওরূপ করিও না, তাহা হইলে নিশ্চয় মারা যাইবে'। আমি কিছুতেই শুনিলাম না। সে আগ্রহ সহকারে আমাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে আমি বলিলাম 'মৃত্যুকে আমি বিশেষ ভয় করি না, আর 'গ্নামপা বা জাম্বা' (অর্থাৎ মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব, যিনি তুষিত স্বর্গে আছেন) নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন। তোমরা আমার জন্য দুঃখিত হইও না।'

তখনও আমার নিকট প্রায় পঞ্চাশ টাকা ছিল। আমি তাহা

বাহির করিয়া ভুটিয়াদের দিলাম। তাহাদের নিকট একপ্রকার মূল্যবান্ পশ্মিনা কাপড় ছিল। উহা একপ্রকার গৃহপালিত ইন্দুর বা তাদৃশ প্রাণীর শীতকালে জাত কোমল লোম বা fur হইতে প্রস্তুত হয়। তাহারা বলিল যে উহা অত্যন্ত গরম (বোধ হয় পৃথিবীর সমস্ত কাপড় অপেক্ষা)। আমি তাহারই কিয়ৎ পরিমাণ এবং 'নিম্বু' নামক কাপড়ের একপ্রকার মোটা কোট যাহা তাহারা ব্যবহার করে, তাহারও একটা চাহিলাম। তাহারা তুষ্ট হইয়া উহা দিল। আমি এক মাসের উপযুক্ত আহার্য্যও লইলাম। তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক কাষ্ঠপাত্র হইতে ছাগ ও চমরীর মাখন বা ঘৃত বাহির করিয়া দিল। আমি প্রথমে তাহার হরিদ্রাবর্ণ ও গন্ধ দেখিয়া লইতে চাই নাই, কিন্তু উহা ব্যতীত প্রাণ ধারণ হইবে না বলিয়া শেষে উহা লইলাম। তদ্ব্যতীত এক জোড়া পশমের জুতা যাহা জানু পর্য্যন্ত লম্বা হওয়াতে জুতা ও মোজা উভয়ের কার্য্য হয়, তাহাও লইলাম। উহারা সমস্তই আমাকে প্রসন্ন হইয়া দিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে তাহাদের নিকট হইতে এক বিলাতী সূচ ও সূতা (তাহারা সূচ ও সূতা বহুপরিমাণে স্বদেশে লইয়া যায়) লইয়া সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া এবং তাহাদের সাহায্য পাইয়া দোহারা পশ্মিনার পাজামা ও জামা প্রস্তুত করিয়া লইলাম। তাহারা সেই 'নিম্বুর' জামা অপেক্ষা আমাকে সলোম চর্ম্মের জামা ও পাজামা উপরে পরিতে বলিল ও উহা আমাকে দিল। বলিল, উহাতে অধিক কার্য্য হইবে। মস্তক, কর্ণ, নাসিকা, গলদেশ আবৃত হয়, কিন্তু কেবল চক্ষু খোলা থাকে, এরূপ একপ্রকার মস্তকাবরণও তাহারা প্রস্তুত করিয়া দিল। উহা অনেকটা Balaclava capএর মত।

পর দিন প্রাতে ভুটিয়ারা চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমার নিকট অনেক বিনয় করিল ও "জিউ কাশীলামা" "জিউ কাশীলামা"

বলিয়া অভিবাদন করিতে করিতে চলিয়া গেল। রুগ্ন ভুটিয়া যাইবার সময় আমাকে একটু মৃগনাভি দিয়া গেল।

আমি যে একবারে জীবনপাত করিব মনে করিয়াছিলাম তাহা নহে। আমি ফিরিবার পথও চিন্তা করিয়াছিলাম। স্থির করিয়াছিলাম, পনের দিনের আহার সেখানকার কোন কন্দরে রাখিয়া যাইব, আর পনের দিনের রুটি প্রস্তুত করিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইব। তন্মধ্যে পাঁচ ছয় দিন অগ্রসর হইয়া যদি অভীষ্ট স্থানে পৌঁছিতে না পারি, তবে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গাড়োয়ালে ফিরিয়া আসিব।

তদনুসারে সেই দিন আমি আটাতে ঘৃত, লবণ, মসলা দিয়া মাখিয়া অর্দ্ধ অর্দ্ধ সের ওর্জনের পনেরখানা রুটি প্রস্তুত করিয়া লইলাম। উষ্ণ ভস্মের মধ্যে রাখিয়া খুব শুষ্ক করিয়া সেইরূপ রুটি প্রস্তুত করা, আমি পাঞ্জাবে শিখিয়াছিলাম। শুষ্ক হওয়াতে ও তথায় অতিশয় শীত বলিয়া উহা বহুদিন অবিকৃত থাকিত।

পরদিন প্রত্যুষে আমি সেই অদ্ভুত বেশে, সেই রুটির বস্তা স্কন্ধে ঝুলাইয়া এক তীক্ষ্ণ লৌহাগ্র যষ্টি হস্তে লইয়া যাত্রা করিলাম। যাইবার সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করিলাম এবং প্রার্থনা করিলাম, "প্রভো, তোমাতেই সমস্ত অর্পণ; এ জীবন থাক্ আর যাক্, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কিন্তু এমন বিষম কষ্টে না পড়ি, যাহাতে তোমাকে স্মরণ করিতে না পারি।" আবার ভাবিলাম, জ্ঞান-ধর্ম্ম কামনা না করিয়া তাঁহার নিকট এ সময় কেন সামান্য পার্থিব কষ্টের লাঘব কামনা করিতেছি? পরে মনে করিলাম, 'প্রাক্তনে যাহা আছে তাহাই হউক; তোমাকে যেন প্রতিপদে স্মরণ করিতে পারি।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দুর্গম পথ।

প্রথমে আমি যে শৃঙ্গ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহার তলদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। যদিও সেই স্থান হইতে আমার অভীষ্ট স্থান সোজাসুজি বিশ পঁচিশ মাইল হইবে, কিন্তু তথায় যাইতে হইলে যে পঞ্চাশ ষাট মাইল না ঘুরিলে যাওয়া যাইবে না তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। সেই 'পর্য্যবেক্ষণ' পর্ব্বতশ্রেণীর (অর্থাৎ যে পর্ব্বতে উঠিয়া আমি ঐ মন্দির প্রথমে দেখিয়াছিলাম) সমান্তরাল আর এক তুষারমণ্ডিত উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী ছিল। অনুমান করিলাম তাহার পরেই সেই অদ্ভুতমন্দিরগামী উপত্যকা পাওয়া যাইবে। অন্ততঃ সেই পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিলে গন্তব্য পথ স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্থির করিলাম। কিন্তু সেই তুষারক্ষেত্র পার হওয়া মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। তজ্জন্য কিছু দূরস্থিত সেই পর্ব্বতশ্রেণীর এক নিম্ন গিরিসঙ্কট লক্ষ্য করিয়া প্রথমে চলিতে লাগিলাম।

পাঠকগণের স্পষ্ট ধারণার জন্য আরও কয়েকটী বিশেষ বিবরণ উল্লেখ করিতেছি। আমরা যে পথ দিয়া ভোটে যাইতেছিলাম তাহা তথায় উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। আমরা উত্তরে যাইতেছিলাম। অতএব যে পর্ব্বতশ্রেণীর গাত্রে পথ নির্ম্মিত ছিল, তাহা আমাদের বামে বা পথের পশ্চিমে ছিল। সেই দিকেই সেই 'পর্য্যবেক্ষণ' পর্ব্বত। তাহারও আবার উত্তর-পশ্চিমে সেই আশ্চর্য্য মন্দির। কিন্তু প্রথমতঃ আমি একেবারে তদভিমুখে যাইতে না পারিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে সেই গিরিসঙ্কটের (Mountain-passএর) অভিমুখে যাইতে লাগিলাম। তথাকার পর্ব্বত শ্লেট বা শিষ্ট (Schist)

প্রস্তর-নির্ম্মিত হওয়াতে তত দুর্লঙ্ঘ্য ছিল না। গ্রানাইট, ব্যাসল্ট প্রভৃতির বড় বড় শিলাখণ্ডে যে সকল পর্ব্বত নির্ম্মিত, তাহারা নিতান্ত দুরধিগম্য হয়।

আমি বহুকষ্টে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই গিরিসঙ্কটের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। পথে অত্যন্ত শীত করিতে লাগিল। এক একবার ফিরিয়া পশ্চাতের দৃশ্যটা মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে লাগিলাম; যেন ফিরিবার সময় চিনিতে পারি। কিন্তু সেই প্রাতঃকালের বিষম শীতে ও পর্ব্বতের উচ্চতা হেতু আমার আর এক ভয় হইতে লাগিল।

আমি শুনিয়াছিলাম, সেই স্থানের পান্থদের একপ্রকার রোগ হয়। পাহাড়ীরা বলে, উহা গুল্মবিশেষের গন্ধে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। উহা একপ্রকার 'হিমজ্বর'। তাহাতে কিছু বুদ্ধির বিকার ঘটে, কিন্তু শারীরিক বলের তত ব্যত্যয় হয় না। আক্রান্ত ব্যক্তি হয়ত খুব চলিতে থাকে, নয়ত অতীত ও ভবিষ্যৎ চিন্তা ত্যাগ করিয়া শুইয়া পড়ে ও শৈত্যে মারা যায়।

আমি ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে লাগিলাম। সেই গিরিসঙ্কটটী সমুদ্র হইতে প্রায় ১৮০০০ ফিট উচ্চ হইবে অনুমান করিলাম। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় তাহার মধ্যে পৌঁছিলাম। পথে এক স্থানে জল দেখিয়া কিছু আহার করিয়া লইয়াছিলাম, তাহাতেই যা কিছু বিলম্ব হইয়াছিল; নচেৎ কেবলই চলিয়াছিলাম।

সেই গিরিসঙ্কটের ভিতর একহাঁটু পরিমাণ স্নো বা কণিকাতুষার ছিল। যাইতে যাইতে হঠাৎ আমার চক্ষু ও মস্তক গরম বোধ হইল এবং মনটা যেন কেমন উদাস হইয়া গেল। আমি খুব বলপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ চলিলাম। শেষে মনে হইল এই সুকোমল তুষারশয্যায় শয়ন করিয়া থাকি। আমি এক এক বার শুইয়া পড়িতে লাগিলাম

ও পরে আবার চলিতে লাগিলাম। সে সময়টা যে ঠিক কি করিয়াছিলাম তাহা আমার স্বপ্নস্মৃতির ন্যায় বোধ হয়। পারসীতে বয়েদ আছে "দিবানা (দেওয়ানা) বকারে খেশ্ আকুল্" অর্থাৎ পাগলেও স্বার্থবিষয়ে বুদ্ধি প্রকাশ করে। আমি সেইরূপে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পথ অতিক্রম করিলাম। শেষে আমার সংজ্ঞা হইল। মনে হইল, আমার ত 'হিমবিকার' হইয়াছে। আমি কতকটা মৃগনাভি বাহির করিয়া খাইয়া ফেলিলাম। তার পর গন্তব্য স্থান স্মরণ করিয়া ও মনকে অতি দৃঢ় করিয়া তীব্রবীর্য্যের সহিত চলিয়া শীঘ্রই গিরিসঙ্কট পার হইয়া যাইলাম। যাইয়া দেখিলাম, আমি যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই ঠিক। তৎপার্শ্বের উপত্যকাটী অনেক ঘুরিয়া আমার গন্তব্য স্থানের নিকটস্থ সেই ত্রিচূড় পর্ব্বতের নিকটে গিয়াছে। আরও দেখিলাম, উপর হইতে বিচ্যুত এক বিশাল তুষারক্ষেত্র (Glacier) উপত্যকার নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। আমি শুনিয়াছিলাম, ভুটিয়ারা ঐরূপ তুষারক্ষেত্রে গড়াইয়া অবতরণ করে। আমি বিলম্ব না করিয়া, তাহার যে দিকে কম ঢালু ছিল, সেই দিকে উপবিষ্টভাবে গড়াইয়া বেগে নামিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে লাঠির খোঁচা মারিয়া বেগ কমাইতে লাগিলাম। নীচে তুষারক্ষেত্রের প্রান্তে আসিলে অনেকখানি হিমশিলা ভাঙ্গিয়া আমাকে উপরে লইয়া নিম্নস্থ অগভীর জলে পড়িয়া গেল। অল্পের জন্যই আমার প্রাণ বাঁচিয়া গেল। আমি লাফাইয়া এক প্রস্তরে পড়িলাম এবং তথা হইতে সেই অল্পপরিসর উপত্যকা পার হইয়া অপর দিকের পর্ব্বতের কিয়দংশ আরোহণ করিয়া আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল এবং শরীরও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। আর তখন উচ্চ স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রদেশে আসিলেও, রৌদ্রাভাবে অত্যন্ত শীত করিতেছিল।

উপর হইতেই আমি এই পার্শ্বের পর্ব্বতে কতকগুলি কন্দর দেখিতে পাইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি উহাতে আশ্রয় লইবার জন্য উপযুক্ত কন্দর দেখিতে লাগিলাম। অল্পপরিসর কতকগুলি কন্দর ত্যাগ করিয়া শেষে একটী বৃহৎ কন্দর দেখিলাম ও তাহাতেই বাস করিতে মানস করিলাম। তাহার সম্মুখে ঠক্ ঠক্ করিয়া যষ্টির শব্দ করাতে ভিতর হইতে অনেক ও গম্ভীর প্রতিধ্বনি হইল। তাহাতে বুঝিলাম, উহা অতি বৃহৎ কন্দর। উহার ভিতর আমি কতকটা প্রবেশ করিয়া অন্ধকারের জন্য নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইলাম। তখন দীপশলাকা খুঁজিবার জন্য ঝুলিতে হাত দিলাম। সর্ব্বনাশ! দিয়াশলাই তাহাতে নাই। তখন মনে হইল যে, তাহা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকিবার পর একটা বিষয় মনে হইল। সেই গুহার সম্মুখে কতকগুলি শ্বেতবর্ণ কোয়ার্জ পাথরের (Quartz) টুকরা দেখিয়াছিলাম। তাহার দুইটা লইয়া পুনশ্চ গুহায় প্রবেশ করিলাম। কতক দূর যাইয়া ভূমিতলে এক বৃহৎ প্রস্তরে পা ঠেকাতে তাহাতে সেই কোয়ার্জ পাথর সবলে ঘর্ষণ করিতে লাগিলাম। তাহার অবিরল স্ফুলিঙ্গে আশ পাশ কতকটা আলোকিত হইল। তাহাতে দেখিলাম, পার্শ্বে যেন অতি বৃহৎ শ্বেতবর্ণ একটী প্রাণী শুইয়া আছে। প্রথমে আমি চম্কিয়া উঠিলাম। পরে মনে হইল Stalactite নামক শ্বেত চূণা পাথর ঐরূপ Grottoতে বা গুহায় জমিয়া থাকে। তাহাতে সাহস হইল। আমি পুনর্ব্বার প্রস্তর ঘর্ষণপূর্ব্বক চারিদিকে আলোকিত করিয়া বিশেষরূপে দেখিলাম। তাহাতে বুঝিলাম উহা Stalactite নহে, কিন্তু কোন বৃহৎ প্রাণীর অস্থিপঞ্জর*। সে দিকে বাহুয়া

---

* পর দিন গুহায় সূর্য্যালোক প্রবেশ করাতে দেখিয়াছিলাম, যে উহা mastodon-জাতীয় প্রাণীর প্রস্তরীভূত পঞ্জর বা fossil। সম্ভবতঃ অতি ভঙ্গুর পাষাণে নিহিত থাকাতে উহা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

হাত বুলাইয়া দেখিলাম এবং সেখানকার ভূমি সমতল বলিয়া বোধ হওয়াতে সেই খানেই রাত্রিযাপন স্থির করিলাম। বহির্ভাগের তুলনায় সেই গুহার ভিতর বেশ গরম বলিয়া বোধ হইল।

সেখানে অবসন্নভাবে শুইয়া কত কি চিন্তা আসিতে লাগিল। মনে করিলাম, বাঙ্গালা দেশের এক পল্লিগ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া কিরূপ কর্ম্মচক্রে আমি এই দুর্গম হিমগিরিকন্দরে এই প্রাচীন (হয়ত লক্ষ লক্ষ বৎসরের) প্রাণীর অস্থিপঞ্জরের সহিত শুইয়া আছি। আবার মনে করিলাম, এখন যদি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে না পারি, তবে মৃত্যু এক প্রকার নিশ্চয়; কারণ, যে হিমশিলার উপর দিয়া গড়াইয়া নামিয়াছি, তাহার উপরে আরোহণ করা কখনই সাধ্যায়ত্ত হইবে না। একবার এই দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্য অনুতাপও হইল। পরে পরমাত্মাকে স্মরণ করিতে করিতে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া এক এক বার বাহিরের হিমশিলার স্ফুটন বা স্থানচ্যুতির এরূপ ভয়াবহ শব্দ হইতে লাগিল যে অনেকবার আমাকে চমকাইয়া উঠিতে হইল।

পর দিন সেই উপত্যকা ধরিয়া চলিলাম। সর্ব্বত্রই হৈমন্তিক-তুষারপাতের ক্ষয়কারি কার্য্য। তাদৃশ বন্ধুর পথশূন্য স্থানে গমন করা কতদুর দুষ্কর, তাহা ভুক্তভোগীরাই জানেন। একটী পর্ব্বতজঙ্ঘার অদূরেই আর একটী পর্ব্বতজঙ্ঘা থাকিলেও একটী হইতে অন্যটীতে যাইতে হইলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়। এইরূপে বহুকষ্টে আমি চারি দিন চলিলাম। অবশ্য, প্রত্যহ বিশ্রামের জন্য আর গুহা পাইতাম না। কোন বৃহৎ উপলখণ্ডের নীচে বা পার্শ্বে গুড়িসুড়ী মারিয়া থাকিতাম। দিনের ক্লান্তিতে রাত্রে একরকম নিদ্রা হইত।

পঞ্চম দিনের সন্ধ্যাকালে সেই ত্রিচূড় পর্ব্বতের সানুদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। তাহাতে মনে অতিশয় আনন্দ ও উৎসাহ

হইল। পর দিন সেই ত্রিচূড় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া একেবারে আমার গন্তব্য স্থানের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। প্রথম দর্শনে একেবারে হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া যাইলাম। দেখিলাম, প্রায় সহস্র হস্ত নিম্নে এক সমতল ভূমি। উচ্চ হইতে তাহা যেন শান-বাঁধান বোধ হইল। ঐ সমতল ভূমি বা প্রাঙ্গণ প্রায় এক যোজন বিস্তৃত। তৎ-পরে এক অতি বিস্তৃত সুনীল জলাশয়। তাহার উপরে একটী সেতু। জলাশয়ের পরপারে একটী সুন্দর উপবন। তাহার পর ক্রমোচ্চ ভূমিতে সেই অদ্ভুত 'মন্দির'। সেই সমতল স্থানটী সর্ব্বসমেত প্রায় তিন যোজন বিস্তৃত ও চক্রাকার। তাহার চতুর্দ্দিকে জীর্ণতট (precipitous), প্রায় লম্ব ও অতীব বিচিত্র আকারের অনুচ্চ পর্ব্বত-প্রাকার। তাহারও এক যোজন দূরে ক্রমোন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গের পর তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ সকল বিরাজমান। বস্তুতঃ সেই স্থানের শোভা এত রমণীয় যে, আমি তাহা দেখিতে দেখিতে অনেকক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান রহিলাম। কিন্তু তথায় কোন প্রাণীকে দেখিতে পাইলাম না।

পরে তথায় শীঘ্র যাইব বলিয়া সোত্মমে অবতরণ করিতে লাগি-লাম। কিছু দূর অবতরণ করিয়া মনে ভয় হইল, যদি অন্য দিকের ন্যায় আমি যে দিক্ দিয়া নামিতেছি সেদিকেও সমতল ভূমির অব্যবহিত পর্ব্বত খাড়া হয়, তাহা হইলে কি করিব? যত নিম্নে আসিতে লাগিলাম তত গরম বোধ হইতে লাগিল এবং অল্প অল্প উদ্ভিদ্‌ও দেখা গেল। এক স্থানে কয়েকটী বৃহৎ বৃহৎ দেবদারু বৃক্ষও দেখিলাম। সেখানকার আরও কয়েকটী বৃক্ষকে দূর হইতে আমি আমড়া বৃক্ষ মনে করিয়া সকৌতুহলে সেদিকে যাইয়া দেখি, সেগুলি অক্ষোট বৃক্ষ। কয়েকটা বাদাম বৃক্ষও তথায় দেখিলাম। কিন্তু তখন তাহাদের ফল পাকে নাই।

আমি ক্রমশঃ নীচে যাইয়া প্রায় শত হস্ত থাকিতে দেখিলাম, যাহা

শঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই যথার্থ। সেখানে পর্ব্বতটী একবারে খাড়া হইয়া নামিয়াছে। সমতল ভূমি হইতে কোন স্থানেই চল্লিশ পঞ্চাশ ফিটের কম উচ্চ দেখিলাম না। তাহাতে আমি একবারে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। মনে করিলাম, এত শ্রম সমস্তই ব্যর্থ হইল। কয়েকবার উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিলাম, (যদি কেহ তথায় থাকে তবে উত্তর দিবে, এই আশায়), কিন্তু কেহ প্রত্যুত্তর দিল না।

কিয়ৎক্ষণ বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া থাকিয়া পরে নামিবার চেষ্টায় পুনরায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। কতকক্ষণ ঘুরিয়া এক স্থানে দেখিলাম, একটী প্রায় পঞ্চাশ ফিট উচ্চ প্রস্তর মধ্য ভাগে ফাটিয়া রহিয়াছে। ফাটটা প্রায় দুই হস্ত প্রশস্ত ছিল। আমি তাহা দিয়া নামিব স্থির করিয়া জুতা খুলিয়া ফেলিলাম। বাল্যকালের ব্যায়ামাভ্যাস-বলে দুই পার্শ্বে হাত ও পা চাপিয়া লাগাইয়া ক্রমশঃ অবতরণ করিতে লাগিলাম। শেষে নির্ব্বিপদে নীচে আসিলাম। তখন মনে অত্যন্ত হর্ষ হইল, কিন্তু শরীর পরিশ্রমে কাঁপিতেছিল। তাই আমি সেই সমতল ভূমিতে যাইয়া বসিয়া পড়িলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত মন্দির।

বসিয়া বসিয়া দেখিলাম, সেই সমতল ভূমি প্রস্তরনির্ম্মিত। কিন্তু প্রস্তরের সন্ধি কোথাও না দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সেই দূরস্থ সেতু লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। যত যাইতে লাগিলাম, ততই সেই প্রস্তরময় বিশাল

প্রাঙ্গণ। তাহা এমনি সুপরিস্কৃত, যেন বোধ হয় কেহ এইমাত্র মার্জ্জিত করিয়া গিয়াছে। তিন ক্রোশের অধিক চলিয়া তবে সেই সেতু পাইলাম। যে জলাশয়ের উপর সেই সেতু, তাহা প্রায় অর্দ্ধ মাইল হইবে এবং পরিখাকারে মধ্যস্থ স্থানকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহার জল এত স্বচ্ছ ও গভীর যে, তাহা সমুদ্রের ন্যায় নীলবর্ণ দেখাইতেছিল। সেখানকার সমস্তই আশ্চর্য্যজনক। তজ্জন্য বার বার আশ্চর্য্য শব্দ ব্যবহার না করিয়া আমি বর্ণনা করিয়া যাইব।

তাদৃশ সেতু পৃথিবীর কোন স্থপতি কল্পনাও করে নাই। উহা ধনুকাকার, প্রশস্ত এবং একটিমাত্র প্রস্তরে নির্ম্মিত। মধ্যস্থান জল হইতে প্রায় পঁচিশ হস্ত উচ্চ হইবে। তথা হইতে জল ও স্থলের যে দৃশ্য দেখা যায়, তাহা অনির্ব্বচনীয়রূপে মনোরম। সেই সেতুর উভয় পার্শ্বে একপ্রকার অপূর্ব্ব রকমের বেড়া দেখিয়াছি। সেতুর উপর হইতে এক একটি বৃহৎ, পাষাণময়, স্বাভাবিকের ন্যায় সুগঠিত হস্ত উঠিয়াছে। সেই হস্ত সকল, সেতুর সহিত সমান্তরাল ভাবে স্থিত একটি লম্বা দণ্ডকে মুঠা করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। নীচে এক একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ দণ্ড হস্ত সকলকে এক এক বার বেষ্টন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখানে বলিয়া রাখি, সেখানকার সমস্ত বেড়াই ঐরূপ এবং তথাকার স্তম্ভ সকল এক একটি পদের আকৃতি।

সেই সমতল ভূমিতে আসিয়া শীত একবারে অদৃশ্য হইয়াছিল। নিম্নস্থ প্রস্তরের সতাপ অবস্থা তাহার কারণ বলিয়া পরে জানিয়াছিলাম। আমি গাত্রের সমস্ত বস্ত্র উন্মোচন করিয়া কৌপীন মাত্র পরিয়া চলিলাম। প্রথম হইতে এই কাল পর্য্যন্ত আমি গাত্র-বস্ত্র উন্মোচন করি নাই। সেতু পার হইয়াই উপবন পাই-

লাম। তাহা শীত ও উষ্ণ-প্রধান দেশের নানাবিধ সুন্দর সুন্দর কুসুমিত ও ফলযুক্ত বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ।

তথায় স্নান করিবার ইচ্ছা হওয়াতে নিকটস্থ এক দেবদারু বৃক্ষ হইতে দন্তকাষ্ঠ ভাঙ্গিতে যাইলাম। একটি শাখা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমি উহা নত করিতেও পারিলাম না। ছুরী বাহির করিয়া কাটিতে যাইলাম, কিন্তু তাহাতে দাগও হইল না। কিন্তু ছুরীর ধার টীনের মত মুড়িয়া গেল। ইহাতে আমি ভীত হইলাম। দেখিতেছি, সেই দেবদারু বৃক্ষ, সেই বর্ণ, সেই গাত্র, সেই মোচার আকার ফল (Fir cones), কিন্তু তাহা হীরক অপেক্ষাও কঠিন এবং লৌহ অপেক্ষাও অভঙ্গুর। আমি মনে করিলাম, আরব্যোপন্যাসের বর্ণিত কোন মায়াময় পুরীতে যথার্থই আসিয়া পড়িয়াছি ; আর রক্ষা নাই।

পরে আবার সাহস করিলাম। মনে করিলাম---আমার ন্যায় অকিঞ্চন ব্যক্তিকে দিয়া মায়াবী কি করিবে ; বিশেষতঃ 'মরার বাড়া' যখন গাল নাই এবং সেই 'মরাকে' যখন আমি বিশেষ অনিষ্টকর ঘটনা মনে করি না, তখন আর আমার কি হইবে ? শেষ পর্য্যন্ত ধীরভাবে দেখা ব্যতিরেকে এখন আর আমার গত্যন্তর নাই।

এই মনে করিয়া তথায় স্নানাহারপূর্ব্বক সেই উপবন পার হইয়া যাইলাম। তৎপরে আবার সেইরূপ প্রস্তরময় ও মসৃণ প্রাঙ্গণ পাইলাম। তাহা ক্রমোচ্চ হইয়া সেই অদ্ভুত প্রাসাদের নিকট গিয়াছে। প্রাসাদ তথা হইতেও কিছু অধিক দুই মাইল হইবে। আমি দ্রুত চলিতে লাগিলাম, কারণ তখন বেলা চতুর্থ প্রহর হইয়াছিল ; নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, সেই প্রাসাদটি অর্দ্ধ-ডিম্বাকৃতি (অর্থাৎ যে ক্ষেত্রের উপর প্রাসাদটি নির্ম্মিত তাহা অর্দ্ধ-Elliptical) এবং অতি বৃহদায়তনের। উহা উপর্য্যুপরি তিন

স্তবকে বিভক্ত। প্রথমটী ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিতীয়টী রক্তবর্ণ ও তৃতীয়টী শুভ্রবর্ণ। প্রত্যেক স্তবক পঞ্চাশ যাট হস্ত উচ্চ হইবে। প্রথম স্তবকটী অতিশয় বিস্তৃত, তদুপরি দ্বিতীয়টী তদপেক্ষা অল্প বিস্তৃত, তৃতীয়টী আরও অল্প। এইজন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের হর্ম্ম্যের সম্মুখে অনেকখানি খোলা স্থান ছিল। আমার ঠিক সম্মুখ ভাগে নিম্ন স্তবকে একটী অতি বৃহৎ দ্বার দেখিতে পাইলাম। তথা হইতে প্রাসাদ দুই পার্শ্বে স্থূল হইয়া অর্দ্ধডিম্বাকৃতি হওত পশ্চাৎস্থিত একটী উন্নত প্রাচীরে যাইয়া শেষ হইয়াছে। সেই বৃহৎ দ্বার ব্যতীত উহার উভয় পার্শ্বে আরও শত শত ক্ষুদ্র দ্বার দেখিতে পাইলাম। ঐ প্রাসাদ একটীমাত্র সন্ধিশূন্য পাষাণে নির্ম্মিত।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। আমি সেই বৃহৎ দ্বার লক্ষ্য করিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম দ্বারটী অতি বৃহৎ (প্রায় পনর হস্ত উচ্চ হইবে), কিন্তু কবাটশূন্য (সেখানকার সমস্ত দ্বারই কবাটশূন্য)। আমি সেই বৃহৎ দ্বার দিয়া এক অতি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। বোধ হয় পৃথিবীতে তত বড় প্রকোষ্ঠ আর নাই। আমি দ্রব্যের মোট ফেলিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া পড়িলাম। বসিয়া বসিয়া ঘরটী দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, উহা অষ্টকোণ এবং মসৃণ সুন্দর সন্ধিশূন্য প্রস্তরে নির্ম্মিত। উহার ছাদ কটাহাকার এবং উপরিভাগে 'বায়ু নির্গম করিবার পথের' (Ventilator) ন্যায় কতকগুলি ছিদ্র আছে। ঘরটী যে প্রস্তরে নির্ম্মিত তাহা অস্বচ্ছ, কিন্তু ভিত্তিগাত্রে বৃহৎ চক্রাকার স্বচ্ছ প্রস্তর সারে সারে বসান ছিল। তাহাতে গৃহ আলোকিত হইতেছিল। কিয়ৎকাল পরে সূর্য্যাস্ত হইলেও সেই স্বচ্ছ চক্রাকার প্রস্তর সকল আলোকিত থাকাতে আমি বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম উহারা সব Phosphorescent বা স্বালোকযুক্ত। 'বলোগ্না

ফস্‌ফরাস্‌' (Baryta sulphate) প্রভৃতি ঐ জাতীয় দ্রব্য হইতে উহা বহু গুণে অধিক আলোকসম্পন্ন। তাহাতে ঘরটি চন্দ্রালোকের ন্যায় আলোকিত হইত। (সেখানে মেঘ না থাকাতে প্রতিদিন সূর্য্যরশ্মি প্রাপ্ত হওত রাত্রে উহা আলোকিত হইত) বাহিরের প্রাঙ্গণও অল্প পরিমাণে ঐরূপ স্বালোকযুক্ত ছিল।

আমি মনে করিলাম, আজ রাত্রে আর কিছু না করিয়া পরদিন সব দেখিব। আমি সেই গৃহমধ্যে ভূমিতলে শুইয়া রহিলাম। সেখানে শীত বা গ্রীষ্ম কিছুই বোধ হয় না। সেই প্রস্তর-প্রাঙ্গণের স্বাভাবিক ঈষৎ উষ্ণতাই তাহার কারণ বলিয়া পরে জানিয়াছিলাম। রাত্রে আমার গভীর নিদ্রা হইল। নিদ্রাবস্থায় এক স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, যেন আমি এক খরস্রোতা নদী সন্তরণ করিয়া পার হইতেছি। পর পারে পৌঁছিব পৌঁছিব এমন সময় যেন আমার বলের হ্রাস হইল এবং স্রোতও প্রবল বোধ হইল। তাহাতে আমি মনে করিলাম যে, কতকদূর ভাসিয়া যাইয়া পরে পারে উঠিব। সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বহু দূর গিয়া পড়াতে সভয়ে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখিলাম, তখন উষাকাল।

পরে বাহিরে আসিয়া আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, স্থানে স্থানে ভিত্তিগাত্র হইতে নিঃসৃত স্বচ্ছ জল অনেকগুলি অপরিসর, মসৃণ উপাদানে নির্ম্মিত, নালা দিয়া বহিয়া যাইতেছে। তাহারা আবার শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কেহ দূরে কেহ বা নিকটে ভূগর্ভস্থ গর্ত্তে তির্য্যগ্‌ভাবে প্রবেশ করিতেছে। আমি মনে করিলাম ইহাই এখানকার মল-মূত্র-ত্যাগের স্থান বা ড্রেণ। উভয় পার্শ্বে যে ছোট ছোট দ্বারগুলি দেখিয়াছিলাম, তাহার একটায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহা অল্প অন্ধকারময় গুহা। গুহা সকল দুই স্তবকে ছিল। উপরের স্তবক ভিত্তিস্থিত এক বৃহৎ থাঁজে

নির্ম্মিত। তাহাতে উঠিবার জন্য পশ্চাৎস্থ প্রাচীরলগ্ন ক্রমোন্নত এক পথ ছিল। সর্ব্বসমেত উভয় পার্শ্বের দুই স্তবকে দুই সহস্রাধিক তাদৃশ বাসগুহা ছিল। গুহা সকলের দ্বারের উপরে আলোক যাইবার জন্য স্বচ্ছদ্রব্যাবৃত এক একটী গবাক্ষ ছিল।

সেই অদ্ভুত হর্ম্ম্যটী যে ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেস্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হওয়াতে তথা হইতে সেই উপবন-জলাশয়াদি সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইত। (কারণ ঐ মন্দিরটীর চতুর্দ্দিকে যে প্রস্তরময় প্রাঙ্গণ ছিল তাহা দুই মাইল ধরিয়া ক্রমশঃ ঢালু হইয়া ঐ উপবন পর্য্যন্ত গিয়াছে। সুতরাং উপবন, জলাশয় আদি ঐ স্থান অপেক্ষা কিছু নিম্নে ছিল।) বালসূর্য্যের কিরণপ্রভায় অনুরঞ্জিত হইয়া সেই উপবন, জলাশয়, পর্ব্বতমালা এরূপ অনির্ব্বচনীয়রূপে সুন্দর দেখাইতেছিল, যে তাহার উপমা বোধ হয় পৃথিবীতে নাই; বোধ হয় পৃথিবীর কোন কবি বা চিত্রকর তাহা কল্পনাও করেন নাই। আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ বহুক্ষণ সেই চিত্র-বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। সূর্য্য যতই উপরে উঠিতে লাগিল, সেই দৃশ্য ততই বিভিন্ন ভাব ধারণ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি পুনরায় সেই বৃহৎ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, দ্বারের সম্মুখে বিপরীত দিকে যে ভিত্তি, তাহাতে আর একটী ক্ষুদ্র দ্বার রহিয়াছে। তাহা হইতে একটী মসৃণ পথ ক্রমোচ্চ হইয়া উপরে গিয়াছে। পথটী অন্ধকারময় ও দীর্ঘ। তাহার শেষ ভাগে একটী উজ্জ্বল পদার্থ রহিয়াছে। আমি তাহা উপরে উঠিবার পথ মনে করিয়া উঠিতে যাইলাম। কিন্তু প্রবেশমাত্র কোন অদৃশ্য শক্তি আমার চর্ম্মে সূচীবেধবৎ অসহ্য পীড়া উৎপাদন করিল। আমি ঝটিতি সেই ক্ষুদ্র দ্বারের বাহিরে বৃহৎ প্রকোষ্ঠে ফিরিয়া আসিলাম। সেই বৃহৎ প্রকোষ্ঠে কোনপ্রকারের দ্রব্যাদি ছিল না,

কেবল ভিত্তির গায়ে গায়ে চতুর্দ্দিকে অনুন্নত মঞ্চ ছিল। আমি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া সেই মঞ্চের ধারে ধারে ঘুরিতে লাগিলাম। মঞ্চের একস্থানে দেখিলাম, কয়েকখানি ভূর্জ্জত্বক্ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে কি লেখা আছে দেখিয়া আমি সাগ্রহে তথায় বসিয়া, তাহার এক কোণ ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু যে টুকু ধরিয়াছিলাম, তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। তাহাতে জানিলাম, উহা বহু প্রাচীন।

ঐ ভূর্জ্জপত্র ব্রাহ্মী অক্ষরে (অশোকের সময়ের) লিখিত দেখিয়া আমার অত্যন্ত হর্ষ হইল। কারণ উহা আমি পড়িতে পারিতাম। কাশীতে অবস্থানকালে আমি প্রত্নলিপির অনেক চর্চ্চা করিয়াছিলাম; দেখিলাম, উহা পালি ভাষায় লেখা। আমি সাগ্রহে তাহা পাঠ করিয়া ঐ স্থানের বিবরণ একরূপ জানিতে পারিলাম। সর্ব্বসমেত তিন পৃষ্ঠা লেখা ছিল। এক পৃষ্ঠ পাঠ করিয়া আমি ছুরী দিয়া সাবধানে তাহা অল্পে অল্পে উঠাইয়া নীচের পৃষ্ঠ পাঠ করিলাম। তাহাতে উত্তোলিত পত্র নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। আমি আগ্রহ-বশতঃ তাহা লিখিয়া লইতে ভুলিয়া যাইলাম। কেবল সর্ব্বনীচের পত্র ভাল রহিল, কিন্তু উহাতে কেবল দুই ছত্র লেখা ছিল।* তাহা এই—"যে আতাপিনো সীলবন্তো ভিক্খবো এতংহি ইদ্ধিমন্দিরে বজির ব নিব্বিকারে আগমিস্সন্তি তেসং বিঞ্ঞানায় ধীরবীরিয়েন ভিক্খুনা ইদং—।" (শেষ শব্দটা অস্পষ্ট) অর্থাৎ যে বীর্য্যবান্ শীলসম্পন্ন ভিক্ষুরা এই বজ্রের মত নির্ব্বিকার ঋদ্ধি-মন্দিরে আসিবেন, তাঁহাদের জ্ঞানের জন্য ধীরবীর্য্য ভিক্ষু ইহা লিখিয়া রাখিলেন।

* পরে এক কাগজে আমি সংস্কৃত ভাষায় ঐ স্থানের বিবরণ লিখিয়া তথায় রাখিয়া দিয়াছিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিশেষ বিবরণ।

ধীরবীর্য্য, যিনি বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু; কারণ তিনি প্রথমেই বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়াছিলেন। তিনি যে সংক্ষেপ বিবরণ দিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম লিখিতেছি। তিনি ইহাকে ঋদ্ধি-মন্দির অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্যের দ্বারা নির্ম্মিত মন্দির বলিয়াছেন। আমিও তাহাই বলিব।

পুরাকালে অস্‌সজি বা অশ্বজিৎ নামক এক ঋষি এই ঋদ্ধি-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তিনি যোগবলে মহাভূত ও ইন্দ্রিয়-রূপ জয় করিলে পর, পৃথিবীতে নানাপ্রকার কুসংস্কার, অজ্ঞতা, কুমত, পাপ, দুঃখ, অত্যাচার প্রভৃতি দেখিয়া তাহার সংশোধন-কামনায় ইহা নির্ম্মাণ করেন। যোগবলে ইহা কল্পান্তস্থায়ী 'বজ্রধাতু' উপাদান দিয়া নির্ম্মাণ করেন। ইহা মানব ব্যতীত অপর প্রাণীর (তির্য্যক্ ও উদ্ভিদ্) অগম্য। ইহার দুই ভাগ (যাহাতে আমি ছিলাম তাহার পশ্চাৎ-স্থিত প্রাচীরের অপর পার্শ্বে ঠিক ঐরূপ আর এক ভাগ আছে)। এক ভাগ ধার্ম্মিকদের জন্য, অপর ভাগ রাষ্ট্রিকদের জন্য। ইহা কল্পান্তস্থায়ী আহার্য্যযুক্ত। অশ্বজিৎ ঋষি মনে করিয়াছিলেন, পৃথিবীব্যাপী পথের দ্বারা ইহা পার্থিব জনতার সুগম করিয়া দিবেন এবং এই স্থলে আসিয়া যে মনুষ্যগণ ধর্ম্মজীবনের ও রাষ্ট্রিক জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাহাদিগকে পৃথিবীর ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও শাসক করিয়া, অজ্ঞতার জন্য ও অযোগ্য ব্যক্তির উন্নত পদে অধিষ্ঠানের জন্য যে সমস্ত দোষ হয়, তাহা নিবারণ করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গোপম করিবেন। কিন্তু তিনি ইহা নির্ম্মাণ করিয়া সে সংকল্প ত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান অবলম্বন করেন। (কেন, তাহা আমি পরে যাহা

বুঝিয়াছিলাম, তাহা অগ্রে বলিব।) তিনি ইহা এরূপ অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, কোন চেতনপুরুষাধিষ্ঠিত না হইলেও, স্বগত স্বাভাবিক শক্তিবশে ইহা কল্পান্তপর্য্যন্ত চলিবে। উপরে উঠিবার সুরঙ্গ-পথই পরীক্ষা-স্থান। তাহাতে উত্তীর্ণ হইলে, তবে উপরের স্তবকে যাইতে পারা যায়। অন্য উপায়ে কেহ যাইতে পারে না। সাত দিন 'ধারা-প্রাপ্ত' আহার করিলে তবে সুরঙ্গ-পথে প্রবেশ করিবার অধিকার হয়। ধীরবীর্য্য প্রথম স্তবকের নাম 'উপসম্পদা আগার,' দ্বিতীয়ের নাম 'মগ্‌গজীবী আগার' ও তৃতীয়ের নাম 'মগ্‌গজিন আগার' দিয়াছিলেন (মগ্‌গজীবী বা মার্গজীবী অর্থে সাধনমার্গে গমনশীল এবং মার্গজিন বা মার্গজয়ী অর্থে সাধন-সিদ্ধ) শেষে তিনি বলিয়াছিলেন "বিতিং পরিবজ্জয়ে" ইহার অর্থ আমি পরে বুঝিয়াছিলাম। ধারা-প্রাপ্ত আহার হইতে বুঝিয়া লইলাম, বাহিরে ভিত্তিগাত্রস্থ কোন ধারা হইতে কোনপ্রকারে আহার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অষ্টকোণ ঘরকে ধীরবীর্য্য মণিমণ্ডপ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

লেখা ছিল, অশ্বজিৎ ঋষি মহাভূতরূপ ও ইন্দ্রিয়রূপ জয় করিয়াছিলেন। এখানে মহাভূতরূপ ও ইন্দ্রিয়রূপ জয় কাহাকে বলে, তাহা পাঠকদের কিছু বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। কারণ, তাঁহাদের অধিকাংশই বোধ হয় যোগশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নন। সাধারণ অবস্থায় আমরা ইচ্ছার দ্বারা হস্তপদাদি চালনা করিতে পারি, কিন্তু শরীরের বাহস্থ কোন দ্রব্যকে ইচ্ছামাত্রের দ্বারা চালনা করিতে পারি না। যদি অভ্যাসের দ্বারা মনকে এক বিষয়ে এরূপ নিবিষ্ট করা যায় যে, তখন তদ্ব্যতীত অন্য কিছুমাত্রের বোধ না হয়, তখন তদবস্থাকে সমাধি বলে। সমাধিতে শরীর-নিরপেক্ষ হইয়া (অর্থাৎ এখন যেমন শরীরে একটা বাঁধা ভাব আছে, তাদৃশ ভাব ত্যাগ করিয়া)

মন ধ্যেয় বিষয়ে তন্ময় হইয়া যায়। তাহাতে সেই ধ্যেয় বস্তুকে নিজ শরীরের মত বা তদপেক্ষা আরও সম্যক্‌রূপে চালিত বা আয়ত্ত করিতে পারা যায়। সমাধির দ্বারা কোন বস্তুকে ক্রমশঃ আয়ত্ত করিতে থাকার নাম "সংযম"। সংযমবল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিলে জ্ঞান ও শক্তির সীমা থাকে না। তাদৃশ বলীয়ঃ ও স্বাধীন মনের দ্বারা শব্দাদি ভূতগণের ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বাহ্য ও আভ্যন্তর সমস্ত ধর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা যায় ও সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করা যায়। করস্থ মধুখপিণ্ডবৎ তখন ভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে ইচ্ছামাত্রের দ্বারা অনুপ্রবেশপূর্ব্বক তাহাদের আকার-প্রকারকে অভীষ্টরূপে পরিবর্ত্তিত করা যায়। তাদৃশ জ্ঞান ও শক্তির দ্বারাই অশ্বজিৎ যোগী সেই ঋদ্ধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম পরীক্ষা।

আমি বাহিরে আসিয়া এক নালার জলে স্নান করিলাম। ঐ জল পরিস্রুত জলের ন্যায় নির্ম্মল। পরে ভিত্তিগাত্র দেখিতে দেখিতে কিছু দূরে অর্থাৎ প্রায় মধ্যস্থলে দেখিলাম, এক বৃহৎ গহ্বর রহিয়াছে। নিকটে যাইয়া দেখিলাম, ঐ গহ্বর বৃহৎ চতুষ্কোণাকৃতি এবং হর্ম্ম্য ভেদ করিয়া বহু দূর ভিতরে গিয়াছে। এই গহ্বরের ছাদ হইতে নিরন্তর জল পড়িতেছে এবং তৎপ্রদেশে এক-মানুষ গভীর এক কুণ্ড রহিয়াছে। ঐ কুণ্ডের তল বাহিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষা কিছু উচ্চ হওয়াতে তাহার সম্মুখের ভিত্তিস্থিত কয়েকটী ছিদ্র হইতে নিরন্তর কুণ্ডস্থ ঈষৎ শ্বেতবর্ণ তরল দ্রব্যের ধারা বহিয়া

যাইতেছে। আমি উহাই 'ধারা-প্রাপ্ত' আহার্য্য মনে করিয়া এক ধারার নিকট যাইয়া কয়েক অঞ্জলি সেই দ্রব্য পান করিলাম। উহার স্বাদ ভালও নহে এবং মন্দও নহে। উহা পান করিয়া আমার বেশ তৃপ্তি হইল।

পরে ঐ আহার্য্যের তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়া জানিয়াছিলাম যে, কুণ্ডের ছাদ হইতে নানাবিধ ধাতব লবণ ও অঙ্গারাম্ল বাষ্প মিশ্রিত জল কদুষ্ণ অবস্থায় নিরন্তর পড়িতেছে। ঐ সমস্ত উপাদান হইতে কুণ্ডস্থিত কোনপ্রকার Yeast বা তজ্জাতীয় জীবাণু বা Bacteria জীবিত রহিয়াছে। তাহাদের নির্য্যাসবিশেষই ঐ আহার্য্য। কুণ্ডের উপরিভাগ জলবৎ, কিন্তু নিম্নভাগ অস্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ। কুণ্ডে পতিত জলে এত অঙ্গারাম্ল বাষ্প ছিল যে, কিছুক্ষণ তাহার সন্নিকটে থাকিলে শ্বাসের ব্যাঘাত জন্মিত।

পরে আমি এক গুহায় যাইয়া বাস স্থির করিলাম। ক্রমশঃ সাত দিন গত হইল। সেই সময়ে এক একবার বাহিরে আসিয়া বসিতাম। নচেৎ প্রায়ই গুহার ভিতরে বসিয়া চিন্তা করিতাম। বাহ্যকার্য্যশূন্য হওয়াতে আমি যেন চিন্তা-রাজ্যে রহিলাম। চিন্তা সকল যেন প্রত্যক্ষ বোধ হইতে লাগিল। তাহাদের বেগ ধারণ করা যে কি দুষ্কর, তাহা আমি তখন বুঝিলাম এবং গুরুর কথাও স্মরণ হইল। ধীরবীর্য্য বলিয়াছেন, ইহা উপসম্পদা দ্বার। তাঁহার কথাও তলাইয়া বুঝিতে লাগিলাম। বৌদ্ধগণ সন্ন্যাসগ্রহণক উপসম্পদা বলেন। অতএব নিবৃত্তিমার্গের ইহাই প্রথম সোপান। তখন আমি স্বহৃদয়কে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, তাহাতে নিবৃত্ত হইবার আন্তরিক ও অকপট ইচ্ছা আছে কি না। এত দিন আমি নিজেকে নিবৃত্তিমার্গগামী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু তখন দেখিলাম উহাতে অনেক গোল আছে। আমরা যে নিশ্বাসে

নিবৃত্ত হইব বলি, প্রায় সেই নিশ্বাসেই কোন ভোগের বিষয়ও কল্পনা করিয়া থাকি। এক সাধুকে দেখিয়াছিলাম, সে "যো করে রাম" বলিতে বলিতে গ্রীষ্মকালে শুষ্ক পত্র কুড়াইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, উহা শীতকালে জ্বালাইবে। তখন আমি মনে করিলাম, উহার বলা উচিত "যো করে হাম্"। সেইরূপ আমিও নিজের মনের ভিতর অনেক অশান্ত স্পৃহা রহিয়াছে দেখিয়া শঙ্কিত হইলাম। ভয় হইল, না জানি কিরূপ পরীক্ষা হইবে। হয়ত উপরে কখনই যাইতে পারিব না। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি যতক্ষণ পারিতাম, চিন্তাবেগ দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কখন কখন চিন্তাবেগ এত প্রবল হইত যে, আমি ছুটিয়া গুহার বাহিরে আসিতাম। বুঝিলাম, নির্জন কারাবাস (Solitary imprisonment) কেন এত কঠিন দণ্ড। আরও বুঝিলাম, কেবল প্রশান্তচিত্ত ও আত্মজয়ী মহাত্মগণই এরূপ স্থানে থাকিয়া শান্তিসুখ পাইতে পারেন। যাহা হউক, যখন বিষয়স্পৃহা উঠিত বা মন বিষয়চিন্তা চাহিত, তখন আমি প্রাণপণে অস্পৃহতা ও সচ্চিন্তা আনয়ন করিতাম; কিন্তু অনেক সময় পারিতাম না। এইরূপে সাত দিন কাটিয়া গেল।

অষ্টম দিনের প্রাতঃকালে স্নান করিয়া আমি সভয়ে সেই সুরঙ্গ দিয়া উপরের স্তবকে উঠিতে যাইলাম। তাহার ভিতর প্রবেশ করিলে পূর্ব্বকার মত আর তত বেদনা বোধ হইল না। আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দৃষ্টি সেই সুরঙ্গ-প্রান্তস্থিত উজ্জ্বল পদার্থে মুগ্ধভাবে নিবদ্ধ রহিল। দুই হস্তে দুই ধারের দণ্ডাকার প্রস্তর ধরিয়া উঠিতে লাগিলাম। পরে আমার একপ্রকার সুগন্ধ অনুভব হইতে লাগিল ও শরীর ঈষৎ কম্পিত হইয়া আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল। তখন আমি যেন দেখিলাম সেই সম্মুখস্থিত উজ্জ্বল পদার্থ ফাঁক হইয়া গেল। পরে দেখিলাম যেন আমি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দেশে যাইতেছি। বহু দূর

চলিতে চলিতে আমি এক পার্ব্বত্য নদী পাইলাম। তাহার তীরে এক ক্ষুদ্র পাহাড় রহিয়াছে। আমি তাহার উপর উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, পায়ের নিকট একটা কি চক্ চক্ করিতেছে। আমি উহা উঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া দেখিলাম, উহা একটী সুবর্ণের স্বাভাবিক তাল বা Nugget। ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, সেরূপ আরও অনেক স্বর্ণপিণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত রহিয়াছে। কোনটা অল্প কোনটা বা বেশী বাহির হইয়া রহিয়াছে। আমার অতিশয় হর্ষ বোধ হইল। মনে হইল, আমি এক সুবর্ণক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে অজস্র সুবর্ণ পাওয়া যাইবে। এই নদী বাহিয়া তাহা লোকালয়ে লইয়া যাওয়া যাইবে। পরে আমার মনে প্রশ্ন হইল, ইহার দ্বারা কি করিব? একবার ভাবিলাম, ইহা পাওয়াতে আমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী হইলাম। ধনিগণের সুখসমূহ মনে হইল। কত কত প্রাসাদ, উদ্যান, দাস, দাসী, স্ত্রী, স্বজন হইবে। শক্তিশালী হইব, সকলের দ্বারা পূজিত হইব, ইত্যাদি কত সুখময় কল্পনা মনে আসিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কাও আসিল। দ্বিজিহ্ব চাটুকার, অবিশ্বাস্য বন্ধু, ভ্রষ্টা স্ত্রী, ব্যসনী পুত্র, অকৃতজ্ঞ দাস, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, মদমত্ততা, আর জরা, মৃত্যু প্রভৃতিও ত জুটিবে। শঙ্কার ভাগ অধিক হওয়ায় আমি ধনীর জীবনে কিছুই বাঞ্ছনীয়তা বা সুখ দেখিতে পাইলাম না; বরং ঐ সুখ গরলমিশ্রিত মধুর ন্যায় বোধ হইল। মনে হইল, তবে আর এই স্বর্ণরাশি দিয়া কি করিব? শেষে ভাবিলাম, কেন ইহার দ্বারা জগতের উপকার করি না? মনে করিলাম কাশীর সেই বাড়ী-ওয়ালাকে ধনাঢ্য করিয়া দিব। কিন্তু পরে মনে হইল, তাহাতে কি সে অধিকতর সুখী হইবে? ভাবিয়া দেখিলাম, ইহাতে তাহার সুখ কিছুমাত্র বৃদ্ধি হইবে না। এখন সে পুত্র-কন্যাদের জন্য পাঁচ পাঁচ শত টাকা রাখিয়া যাইতে পারিলে নিজকে যেরূপ সুখী মনে করে, তখন

লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইলে সে নিজকে সেইরূপ সুখী মনে করিবে। এখন সে উত্তমোত্তম দ্রব্য না খাইতে পাইয়া যেরূপ দুঃখ বোধ করে, তখন সে অম্লরোগে পীড়িত হইয়া তাহা না খাইতে পারিয়া সেইরূপ দুঃখিত হইবে। বিশেষতঃ পৃথিবীতে কত কত নিঃস্ব ব্যক্তি রহিয়াছে; দুই চারি শত বা সহস্র লোককে ধনী করিয়া আর কি হইবে? তার পর ভাবিলাম, আমার এই বিপুল স্বর্ণরাশি পৃথিবীর সমস্ত নিঃস্বকে কেন ভাগ করিয়া দিই না। আবার ভাবিয়া দেখিলাম, তাহাতেই বা কি হইবে? কেবল সুবর্ণই সহজপ্রাপ্য হইবে মাত্র। অন্ন ও বস্ত্র, যাহার জন্য প্রধানতঃ লোকের দুঃখ, তাহা ত এই সুবর্ণরাশির দ্বারা একটুমাত্রও বৃদ্ধি পাইবে না। এখন এক মোহরে পাঁচ মণ চাউল পাওয়া যায়, তখন হয়ত আড়াই মণ হইবে। অতএব লোকের কষ্ট যাহা আছে, তাহাই থাকিয়া যাইবে। এই সকল চিন্তা করিয়া সেই সুবর্ণরাশির উপর অতি হেয় ভাব আসিল। মনে করিলাম, এইজন্যই সাধকগণ সুবর্ণকে লোষ্ট্রবৎ বিবেচনা করেন। এই মনে করিয়া আমি সেই সুবর্ণ-পিণ্ডকে পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দিয়া তথা হইতে নদীর তীরে তীরে চলিলাম। বুঝিলাম, অর্থের দ্বারা প্রকৃত সুখ দেওয়া যায় না। আকাঙ্ক্ষা ও ভোগলোলুপতা কমাইতে না পারিলে কাহাকেও সুখী করা যায় না। "ন কার্ষাপণবর্ষেণ তৃপ্তিঃ কামেষু বিদ্যতে।" সুবর্ণদান অপেক্ষা লোককে ধর্ম্মনিষ্ঠা দান করিতে পারিলে প্রকৃত ও স্থায়ি কল্যাণ হয়। কিছু দূরে গিয়া এক বন পাইলাম। সেই বনের ফল ও মূল খাইয়া তন্মধ্য দিয়া সবীর্য্যে চলিলাম। অত বড় লোভের বিষয় পরিত্যাগ করাতে মনে অতিশয় বল ও কিছু গর্ব্বও হইয়াছিল। যাইতে যাইতে সম্মুখে দুইটা ভল্লূক পড়িল। আমি বম্ বম্ রবে লাঠি ঠুকিয়া, ভয় দেখাইয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিলাম। এইরূপে সেই বন পার হইয়া কিছু দিন চলিতে চলিতে এক গ্রামে পৌঁছিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম পরীক্ষার শেষ ফল।

গ্রামে পৌঁছিয়া আমি নিরপেক্ষভাবে মাধুকরী (ভিক্ষা) করিতে যাইলাম। কয়েক বাটীতে 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বলিয়া দাঁড়াইলাম। স্ত্রীগণ আমার পাত্রে আহার্য্য দিল। আমি ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মানুসারে নদীজলে ঝুলিশুদ্ধ একবার ডুবাইয়া তীরে বসিয়া আপন মনে আহার করিতে লাগিলাম।

কতকগুলি বালিকা অদূরে স্নান করিতেছিল। তাহাদের কোলাহল আমার কর্ণে আসিতেছিল। হঠাৎ তাহারা হাহাকার করিয়া উঠিল। আমি চাহিয়া দেখি, একটী বালিকা সেই খরস্রোতা নদীতে ভাসিয়া যাইতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া স্রোতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক বহুকষ্টে সেই মৃতপ্রায়া বালিকাকে জল হইতে উঠাইলাম। পরে তাহাকে বহন করিয়া তাহার রোরুদ্যমানা সঙ্গিনীদিগের সহিত তাহার বাটীতে লইয়া যাইলাম।

তাহার পিতা একজন বিদ্বান্, শুদ্ধচেতা ব্রাহ্মণ। তিনি অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। গ্রামের সকল লোকে আমাকে সেই গ্রামে কিছুদিন বাস করিতে বলিল। আমি অগত্যা সম্মত হইলাম। সকলেই আমাকে যত্নপূর্ব্বক আহার করাইত। বিশেষতঃ সেই ব্রাহ্মণ আমাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহার সহিত প্রায়ই নানাবিধ শাস্ত্রালাপ হইত। তিনি আমার সঙ্গের জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। আমারও তাঁহাকে বেশ লাগিত। শেষে তিনি ও গ্রামের অন্যান্য অনেকে আমাকে গ্রামের প্রান্তভাগ ছাড়িয়া গ্রামের মধ্যে সেই ব্রাহ্মণের বহির্ব্বাটীতে আসিয়া বাস করিতে বলিলেন। আমি সম্মত হইলাম। ব্রাহ্মণী আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে যত্ন করিতে লাগিলেন।

আমিও ক্রমশঃ তাঁহাদের সুখ-দুঃখের সহানুভাবক হইয়া পড়িলাম। ব্রাহ্মণকে কষ্ট করিয়া বাগান কোপাইতে দেখিলে আমি কোপাইয়া দিতাম। ব্রাহ্মণীকে কষ্ট করিয়া গোরুর জাব দিতে দেখিলে আমিই উহা দিয়া দিতাম। এইরূপে আমিও যেন তাঁহাদের একজন হইয়া যাইলাম। আমার মন মধ্যে মধ্যে কেমন উদাস হইয়া যাইত, কিন্তু তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় আবার ভুলিয়া যাইতাম।

এমন সময়ে হঠাৎ ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল। ব্রাহ্মণী শোকে অধীরা হইলেন। ব্রাহ্মণের জন্য যেমন শোক, তাঁহাদের কি উপায় হইবে তাহারও জন্য তদ্রূপ শোক। তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন "আমার পুত্রাদি কেহ নাই। কে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ? বাবা, তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইও না।" আমিও মনে করিলাম, এরূপ অবস্থায় ছাড়িয়া যাওয়া কাপুরুষতা। অতএব আমার উপর ক্ষেত্রবিত্তাদির ভার পড়িল। আমি যেন কেমন দুর্ম্মনা হইয়া তাহা করিতে লাগিলাম। এক দিন ব্রাহ্মণী বলিলেন যে, তাঁহার কন্যা বয়স্থা হইয়াছে ; ব্রাহ্মণ থাকিলে এতদিন তাহার বিবাহ হইয়া যাইত। এখন কে পাত্র খোঁজে, কেই বা বিবাহ দেয় ? বিশেষতঃ কন্যাটী কায়মনো-বাক্যে যেরূপ আমার সেবা করে ও আমাকে ভালবাসে তাহাতে অন্য কাহারও সহিত বিবাহ দেওয়া সঙ্গত নয়। অতএব আমিই অনুগ্রহ করিয়া যদি বিবাহ করি, তাহা হইলে তিনি কৃতার্থ হন।

ইহা শুনিয়া যেন আমার সংজ্ঞা হইল। আমি তাহাতে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া যাইবার মানস করিলাম। কিন্তু তাঁহার সজল নেত্র দেখিয়া ও কন্যাটীর মনের দুঃখ হইবে ভাবিয়া তাহা আর পারিলাম না। সে জাল কাটাইতে না পারিয়া আমি গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। ক্রমশঃ আমার পুত্রকন্যা হইল। এদিকে ক্ষেত্রে উপর্য্যুপরি দুই তিন বৎসর শস্য না হওয়াতে সংসারে অনটন হইল। আমি অর্থাগমের

নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। শেষে সেই সুবর্ণক্ষেত্রের কথা মনে পড়িল। সেখানে যাইয়া প্রচুর সুবর্ণ আনিব স্থির করিলাম। তৈজস-পত্র কতক বন্ধক দিয়া ঘরে অন্নের সংস্থান করিয়া এবং স্ত্রীকে ও শ্বশ্রূকে আশ্বাস ও আশা দিয়া আমি চাল চিঁড়া বাঁধিয়া সেই নদীর তীরে তীরে যাত্রা করিলাম। সেই বনের নিকট গিয়া আর প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। মনে হইল, আমি যদি শ্বাপদের দ্বারা নিহত হই, তবে আমার স্ত্রীপুত্রদিগকে কে দেখিবে? মনে করিলাম, যখন এই নদী সেই স্বর্ণক্ষেত্র দিয়া আসিতেছে, তখন ইহার গর্ভেও নিশ্চয়ই স্বর্ণকণা থাকিবে। এই ভাবিয়া আমি বহু কষ্টে সেই নদীর বালুকা ধুইয়া স্বর্ণকণা-সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। কিছু সংগ্রহ হইলে ঘরের জন্য মন বড় ব্যস্ত হইল। সেই নদী হইতে কতকগুলি রঙ্গীন নুড়ীও সংগ্রহ করিলাম। মনে হইল, ইহা সব মূল্যবান্ প্রস্তর হইতে পারে। প্রধানতঃ সেই নুড়ীর ভার বহন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করত একদিন সন্ধ্যাকালে আমাদের গ্রামের সম্মুখে নদীর পর পারে পৌছিলাম। নদীর জল তখন বৃদ্ধি পাওয়াতে সন্তরণ ব্যতীত পার হইবার উপায় ছিল না। গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য মন অতিশয় ব্যস্ত হইল। কারণ পুত্রটীকে রুগ্ন দেখিয়া গিয়াছিলাম। তজ্জন্য আমি সন্তরণ করিয়া পার হইতে লাগিলাম। কিন্তু পৃষ্ঠের ভারে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইলাম। একবার মনে হইল, ভারটা ত্যাগ করি; আবার ভাবিলাম, তাহা হইলে গৃহে কি করিয়া মুখ দেখাইব। এইরূপ ইতস্ততঃ করিতে করিতে আমি ডুবিতে লাগিলাম। তখন আমার ভার ত্যাগ করিবার সামর্থ্য রহিল না। আমি নিস্তেজ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চিত্তের পরিকর্ম্ম।

হঠাৎ একটা প্রবল ধাক্কা পাইয়া আমার সংজ্ঞা হইল। দেখিলাম সেই মণিমণ্ডপে উপুড় হইয়া শুইয়া আছি। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টি বা স্বপ্ন এরূপ সত্যবৎ বোধ হইয়াছিল যে, কতকক্ষণ আমার আমিত্বের গোল-যোগ হইতে লাগিল। শেষে সব পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল। বুঝিলাম আমি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছি। আর পরীক্ষাও কিরূপ, তাহা বিশেষরূপে বুঝিলাম। সেই সুরঙ্গগাত্র হইতে বিকীর্ণ দ্রব্যের বা শক্তি-বিশেষের দ্বারা এবং সেই উজ্জ্বল পদার্থে আকৃষ্টচক্ষু হওয়ার দ্বারা বাহ্-জ্ঞান লোপ হয়। তখন কথঞ্চিৎ দমিত অথবা লুকায়িত প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া এক স্বপ্ন বা দৃষ্টিবিশেষের উদয় হয়। অল্পক্ষণস্থায়ী স্বপ্নে যেন বহুকাল অতীত হইল বলিয়া বোধ হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। প্রবৃত্তির শেষ ফল অবসন্নতা। তাই শেষে অবসন্নতা আসিয়া প্রযাতা মসৃণ সুরঙ্গতলে পড়িয়া যায় ও গড়াইয়া নীচে আসে।

পরীক্ষায় সফল না হইয়া এবং আমার হৃদয়ে এখনও এত প্রবৃত্তি-বীজ নিহিত রহিয়াছে দেখিয়া, আমি অনেকক্ষণ হতাশভাবে পড়িয়া রহিলাম। পরে অশ্রুপাত করিতে করিতে বিঘ্ননাশন ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। তাঁহাকে প্রণব নামেই ডাকিতে লাগিলাম। প্রণব শব্দ সেই উচ্চ মসৃণ প্রকোষ্ঠের ভিত্তি হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া অপূর্ব্ব মধুর বোধ হইতেছিল। যেন এক বৃহৎ অর্গ্যান আমার গানে সুর দিতেছে। সেই গম্ভীর নিনাদে এবং আমার হৃদয়ের অবসন্ন ভাবের জন্য ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে আমার অজস্র অশ্রুপাত ও রোমাঞ্চ হইতেছিল। বহুক্ষণ সেইরূপ করিয়া হৃদয় কিছু শান্ত হইল। তখন মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি নিশ্চয় এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব। তৎপরে সেই মণিমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া আপন গুহায় যাইলাম।

ইহার পর আমি প্রায় একমাস আর উপরে উঠিবার চেষ্টা করিলাম না। সেই সময় কেবল সাধনে রত থাকিলাম। উপনিষদের উত্তমোত্তম বচন এবং পাতঞ্জল যোগসূত্র সকল কেবল তখন আমাকে উৎসাহ এবং আলোক প্রদান করিত। আমি সমস্ত অন্তরায় নিবারণের জন্য ঈশ্বরের প্রণিধানে বিশেষ করিয়া মন দিলাম। প্রথমতঃ সাধারণ সংস্কারবশতঃ অতিশয় দীনতা, বিনতি, চাটূক্তি, স্তুতি, ক্রন্দন প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম। এবং আশা করিতে লাগিলাম, যখন আমি আমার যত দূর শক্তি তত দূর ব্যাকুল হইয়া ডাকিতেছি, তখন তিনি অবশ্যই দেখা দিবেন। ঐরূপ ভাবে কয়েক দিন অনবরত ডাকাতেও যখন তাঁহার দর্শন পাইলাম না, তখন মন কিছু সন্দিগ্ধ হইল। আমি তখন বিচার করিতে লাগিলাম। শেষে যেন আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল। তখন বুঝিলাম, ঈশ্বর কখনই চাটুপ্রিয় নন; কারণ আমাদেরই উহা বিরক্তিকর। বস্তুতঃ চাটুকারিতা ও চাটু-প্রিয়তা নীচ প্রকৃতির সহচর। আর আমি যে আমাকে দীনাতিদীন, অধমাধম বলিতেছি, উহাও অসত্যাচরণ হইতেছে। কারণ আমি দেখিতেছি আমা অপেক্ষা কত দীন ও অধম রহিয়াছে। নিজের দোষ সম্যক্‌রূপে দেখা ও সংশোধন করা উচিত এবং অগর্ব্বিত হইয়া নিজের গুণ জানিয়া কর্ত্তব্যে উৎসাহিত হওয়া উচিত। আরও ভাবিলাম, ঈশ্বর অবশ্য আমা অপেক্ষা অনেক বুঝেন, সুতরাং পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে 'দেখা দাও' 'দয়া কর' প্রভৃতি বলিয়া আমার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে যাওয়া আমার পক্ষে মহাধৃষ্টতা। বিশেষতঃ তাঁহার দর্শন পাইয়া কি আমি কৃতার্থ হইব? তাহাও নহে। আমাকে স্বয়ং নিজের হৃদয়ের বাসনা উন্মূলিত করিতে হইবে। তবে আমি মুক্ত হইতে পারিব। তিনি দর্শন দিলেই যদি ত্রিবিধ দুঃখ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হওয়া যাইত, তাহা হইলে তিনি এত দিন দর্শন

দিয়া সমস্ত জীবকে মুক্ত করিয়া দিয়া জগতে আপনার কারুণ্য ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেন। আর এই যে আমি শোক, ক্রন্দন, দৈন্য প্রভৃতি করিতেছি, ইহা কি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায়? না, তাহাও হইতে পারে না। কারণ এ সমস্ত তমোগুণের বৃত্তি, তদ্দ্বারা ও তদ্বর্ত্ত-মানে কখনও অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না।

তৎপরে আমি উপাসনার প্রণালী পরিবর্ত্তন করিলাম। সাত্ত্বিক-ভাবের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলাম। প্রেমাদি ভাব সাত্ত্বিক ও সুখমূলক। তজ্জন্য তাঁহাকে পরমপ্রেম ও ভক্তির আস্পদ ভাবিয়া এবং সেই প্রেমাস্পদকে প্রাপ্ত হইয়াছি ভাবিয়া আমি নিজকে সুখী ও ধন্য মনে করিতে লাগিলাম। বস্তুতঃ তিনি আমাদের দূরস্থ নহেন। বুঝিয়া দেখিলে তাঁহাকে আমরা পাইয়াই রহিয়াছি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ; যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার দূর ও নিকট নাই। কারণ সর্ব্বত্রস্থ, সমস্ত বস্তুকে যিনি সমানরূপে বিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহার আবার দূর বা নিকট কি? এইহেতু এবং সর্ব্বাধীশ বলিয়া, তিনি সর্ব্বব্যাপী। অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞ বা যিনি সর্ব্বত্রস্থ সকল দ্রব্যকে অতি সমাপের ন্যায় বিজ্ঞাত হন এবং শক্তির দ্বারা সমস্ত অনুপ্রবেশ করিতে পারেন, তিনি অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী। তিনি যখন সর্ব্বব্যাপী বা যখন অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান, তখন বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে আমরা পাইয়াই রহিয়াছি।

আমি তখন সগুণ বা সত্ত্বগুণ-প্রধান ঈশ্বরের উপাসনায় রত ছিলাম। নির্গুণ (ত্রিগুণের অবশীভূত) ভাবে তাঁহার উপাসনা করিতাম না। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধেও আমি বিচার করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, তিনি কি সদাকাল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের পাপ পুণ্য কর্ম্ম টুকিয়া রাখিতেছেন; এবং অহোরাত্র কাহাকে শাস্তি দিবেন, কাহাকে বা পুরস্কার করিবেন, এই চিন্তা

করিতেছেন? এইরূপ প্রতিনিয়ত অবিশ্রামে অসংখ্য জীবের সম্বন্ধে অসংখ্য চিন্তা করাই কি তাঁহার একমাত্র কার্য্য? তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় অশান্তচেতা আর কেহ হইতে পারে না। অতএব তাঁহাকে শান্তির জন্য কে উপাসনা করিবে?

পরে যোগসূত্রের দ্বারা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিলাম। স্থির বুঝিলাম, তিনি ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অস্পৃষ্ট (যোগ-দর্শন ১।২৪); অর্থাৎ তিনি নিষ্ক্রিয়, নিশ্চিন্ত, মুক্তস্বরূপ। ইহা নির্গুণ ঈশ্বরের স্বরূপ। এরূপ ভাবে অল্প অধিকারীই তাঁহাকে চিন্তা করিতে সমর্থ হয়। আমিও তখন আভিমুখ্যকামী হইয়া সগুণ ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভদেবকে উপাসনা করিতাম। যোগশাস্ত্রের দ্বারা তাঁহারও স্বরূপ বুঝিয়াছিলাম। তিনি সাস্মিত নামক মহা-সমাধিযুক্ত হওয়াতে প্রশান্ত, অবাধ, পরমানন্দময় ভাবে সদা মগ্ন আছেন। আমরা যেমন শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া সমাহিত হইলে, কেবলমাত্র সেই অধিষ্ঠানবশেই শরীর জীবনযুক্ত থাকে; সেইরূপ ঈশিতার দ্বারা আয়ত্ত এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরে তিনি অধিষ্ঠিত থাকিয়া আত্মস্থ থাকাতে এই ব্রহ্মাণ্ড সেশ্বর রহিয়াছে। লোকে বিষ্ণু শিব প্রভৃতি নানা নামে তাঁহাকে ডাকে; কিন্তু অধিকাংশ লোকেই তদ্বিষয়ে বিশেষ চিন্তা ও শিক্ষা না করিয়া নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী তাঁহাতে কত কি দূষ্য ভাব আরোপ করে।

এইরূপ স্থির করিয়া আমি তাঁহাতেই অনুরাগ অভ্যাস করিতে লাগিলাম। তজ্জন্য যোগস্থ, পরমানন্দে স্মিতবদন তাঁহার এক মানস প্রতিমা করিলাম। আর স্থির নিশ্চয় করিলাম, তিনি দেহধারণ করিয়া আমার গোচর হইলে সেই দেহেতে যেরূপ থাকিতেন, আমার আন্তর প্রতিমাতেও সেইরূপই আছেন। এইরূপে তাঁহাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়াছি জানিয়া সানন্দে তদ্গত ভাবে থাকিতে

অভ্যাস করিতে লাগিলাম। মনে মনে বলিতাম, 'তুমি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম; অন্তরের অন্তরে তোমাকে সদাই রাখিব। তোমাকে পাইয়া আমি ধন্য ও পরম সুখী হইয়াছি, ইত্যাদি। কিন্তু প্রথম প্রথম 'আমি সুখী হইয়াছি' ভাবিলেই সব সময় সুখ বা প্রেম আসিত না। তজ্জন্য কৌশলে বৈষয়িক সুখকে তাহাতে নিয়োগ করিতাম। পৃথিবীতে মাতা প্রভৃতি যাঁহারা আমার প্রিয় ছিলেন—যাঁহাদের ভাবিলে হৃদয়ে সুখ বোধ হইত—তাঁহাদিগকে প্রথমে ভাবিতাম। পরে তাহাতে যে সুখ বোধ হইত, তাহা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া সেই পার্থিব ভাবনা উঠাইয়া দিয়া ঈশ্বরের ভাবনাকে বসাইয়া দিতাম। উহাতে চিত্ত ক্রমশঃ স্থিতি করিতে লাগিল। তখন তাঁহাতে সম্যক্‌রূপে তন্ময় হইব বলিয়া তাঁহার মূর্ত্তিতে নিজকে ওতপ্রোত ভাবে চিন্তা করত তাঁহাতেই নির্ভর ও আত্মনিবেদন পূর্ব্বক, তিনি যেরূপ মহানন্দে বিরাজমান আছেন তাহাই পরমা গতি জানিয়া, সংকার-সহকারে তাঁহাতেই মগ্ন থাকিতে অভ্যাস করিতাম।

এইরূপে প্রায় মাসাবধি অভ্যাস করাতে অনেক পরিমাণে আমার সেই ভাব আয়ত্ত হইয়া গেল। তখন মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে সুখের উৎস খুলিয়া যাইত এবং তাহাতে পরিপূর্ণসিদ্ধ হইলে যে কি অনির্ব্বচনীয় মহানন্দ হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস বোধগম্য হইত। কখন কখন মনে হইত, যদি তিনি আমার ধ্যেয় সেই মানস প্রতিমায় জাগরূক হইয়া আমাকে আশ্বাস দেন, তবে ভাল হয়। পরে চিন্তা করিতাম, উহাও আমার একপ্রকার নাস্তিকতা বা তাঁহার সত্তায় দৃঢ়নিশ্চয়ের অভাব। মনন বা বিচার আমার সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম না হওয়াই উহার কারণ। তখন বলিতাম "না প্রভো, তোমাকে যেরূপে পাইয়াছি তাহাই ভাল, তোমার এই স্বাভাবিক সমাহিত ভাবই আমার প্রিয়তর।"

আর এক ঘটনায় আমার ঈশ্বরধ্যানের অতিশয় সুবিধা হইয়াছিল। গুহার দ্বারের উপর যে গবাক্ষ ছিল, যাহা আমি আলোক আসিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল জানিতাম, তাহার অন্য এক গুণ ছিল। একদিন ঐশ্বরিক মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া পরে সেই উজ্জ্বল গবাক্ষের দিকে চাহিয়াছিলাম। তাহাতে আমার চক্ষু মুগ্ধবৎ হইয়া গিয়া আমি তাহার ভিতর আমার ধ্যেয় মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। তাহা অবিকল সজীবের ন্যায় এবং আমি তাহাতে যে সকল সদ্‌গুণের অস্ফুট কল্পনা করিতাম, তাহারা অতীব স্ফুট ও পরিপূর্ণরূপে সেই মূর্ত্তিতে অভিব্যঞ্জিত হইল। তাহা দেখিতে দেখিতে আমার ভক্তি এরূপ উথলিয়া উঠিল যে আমি নিস্পন্দ হইয়া গেলাম। আর তখন মহাপ্রভাবের দ্বারা অনুপূরিত সেই মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে সেই প্রভাব যেন আমাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমার মধ্যে অনির্ব্বচনীয় শুদ্ধতা আনিল। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু চঞ্চল হইয়া সেই দৃষ্টি ভাঙ্গিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে আমি গবাক্ষে ঐরূপ দেখিতে পাইতাম। সেই গবাক্ষের এরূপ শক্তি ছিল যে, কোন বিষয় অত্যন্ত কল্পনা করিলে সেই কল্পনার ছবি তাহাতে প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হইত। এইরূপে কিছু কালের জন্য অসীম-মহিমান্বিত প্রস্ফুটরূপে সদ্‌গুণসমূহ বিকিরণকারিণী সজীববৎ ভাগবতী মূর্ত্তির দর্শনে আমি বহুপরিমাণে বিশুদ্ধি লাভ করিতে লাগিলাম।

তখন এই স্তোত্রের দ্বারা প্রায়ই তাঁহাকে নমস্কার করিতাম—

তামীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বর-ন্তাং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥১॥

প্রশান্তং দর্শনং যস্য সর্ব্বভূতাভয়প্রদম্।
মাঙ্গল্যঞ্চ প্রশস্তঞ্চ নমস্তস্মৈ শিবাত্মনে ॥ ২ ॥

মহত্ত্বাদীশ্বরত্বাচ্চ যঃ সদৈব মহেশ্বরঃ।
রাগদ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত-মহেশ্বরায় তে নমঃ॥ ৩॥
মহাজ্ঞানং ভবেদ্‌যস্য লোকালোকপ্রকাশকম্।
মহাদয়া মহাধ্যানং মহাদেবায় তে নমঃ॥ ৪॥
মহৈশ্বর্য্যৈর্ম্মহাদেশঃ ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
মহদাত্মস্বরূপায় ব্যাপিনে বিষ্ণবে নমঃ॥ ৫॥
মহামোহ-বিনির্ম্মুক্তঃ মহাদোষ-বিবর্জ্জিতঃ।
মহাগুণান্বিতস্তস্মাৎ নমো ভূয়ো নমোঽস্তু মে॥ ৬॥
বন্দে দেবমনাত্মবোধহরণং বন্দে পরেশং বিভুং
বন্দে দৈবতমন্যৈকশরণং বন্দে ত্রিলোকেশ্বরম্।
বন্দে ব্যাপনমীশ্বরং স্থরগুরুং বন্দে প্রজেশং হরিং
বন্দে যোগজনাশ্রয়ঞ্চ শমদং বন্দে শিবং শঙ্করম্॥ ৭॥
প্রমোহপারং করুণাবতারং সংসারসারং ভবরোগহারম্।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে মমৈকনাথং পরমং নমামি॥ ৮॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরীক্ষা—দৃঢ় সাধন।

ঐ সময়ের মধ্যে যে আমার বিক্ষেপ আসিত না, তাহা নহে। পূর্ব্বের ন্যায় অনেক কুচিন্তাও আসিত, কিন্তু তাহা প্রায়শঃ সহজে তাড়াইবার সামর্থ্য হইয়াছিল। তবে ঈশ্বর-ভাবে মগ্ন থাকিবার অভ্যাস করাতে বিক্ষেপের অবসর কিছু কম ছিল। মৈত্র্যাদি ভাবনার দ্বারাও চিত্তের প্রসাদ সাধন করিতাম। পূর্ব্বে যাহাদের প্রতি আমার ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি ছিল, তাহাদের কথা ও তাহাদের প্রতি সেই সেই ভাব আমার মনে উঠিয়া অশান্তি আনয়ন করিত।

একজন আত্মীয় আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার অনেক বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করিয়া সুখে কাল যাপন করিত ; তাহার প্রতি আমার ও মাতার অত্যন্ত ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ভাব ছিল। যদিচ এখন আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, তথাপি উপরি-উক্ত প্রকারের অনেক দূষিত সংস্কার এখনও আমার মনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিত। সেই সকলের দমনের জন্য আমি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিয়া হৃদয়কে শুদ্ধ করিতে লাগিলাম। গুরুর নিকট ঐ সমস্ত ভাবনার মন্ত্রও শিখিয়াছিলাম। শত্রু হউক বা মিত্র হউক, সমস্ত সুখী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষাভাব ত্যাগ করিয়া, নিজ মিত্রের সুখে যেরূপ সুখ হয় সেইরূপ ভাবনা করিতাম ; বলিতাম,—'সুখং বসত মিত্রাণি বিবর্দ্ধতু সুখঞ্চ বঃ।' অর্থাৎ হে মিত্রগণ! তোমরা সুখে থাক ও তোমাদের সুখ বর্দ্ধিত হউক। সেইরূপ দুঃখীদিগের (শত্রু মিত্র উভয়ের) প্রতি নিজের উপমায় করুণা ভাবনা করিতাম। প্রায়শঃ আমাদের শত্রুর দুঃখে হর্ষ অথবা অসহানুভূতি হয়। তাহা ত্যাগ করিয়া বলিতাম 'বিমোচয়তু দুঃখাদ্বঃ কৃপয়া যোগদো হরঃ।' অর্থাৎ যোগদাতা হর তোমাদিগকে দুঃখ হইতে বিমোচন করুন। যাহারা আমাদিগের মতের ও অবলম্বিত মার্গের বিরোধী অথবা ভিন্নমার্গ ও ভিন্নমতাবলম্বী, তাহাদিগের অভ্যুদয় দেখিলে আমাদের হৃদয় সাধারণতঃ অপ্রমুদিত হয়। তাদৃশ হৃদয়াশুদ্ধি দূর করিবার জন্য আমি বিভিন্নমতাবলম্বীদিগের পুণ্যাংশ চিন্তা করিয়া হৃদয়ে প্রমুদিত ভাব আনয়ন করিতাম। বলিতাম 'পুষ্পহারঃ প্রমোদায় অন্যেষাং চাপি হারিণঃ। ত্বচ্চরিতস্তথা ধর্ম্মঃ মোদয়তি চ মাং সখে॥' অর্থাৎ—যেমন পুষ্পহার হারধারীর ও অন্য লোকেরও প্রমোদকর হয়, সেইরূপ হে সখে, তোমার আচরিত ধর্ম্ম আমাকেও প্রমুদিত করিতেছে। এইরূপে যাহারা কিছু পুণ্য করিতেছে, তাহারা যে

ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, তাহার অনুমোদনভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া মুদিতা ভাবনা করিতাম। আর পাপকারীদের প্রতি অবজ্ঞা ও ক্রূর ভাব ত্যাগ করিয়া উপেক্ষা করিয়া যাইতাম। মনে করিতাম, ‘কল্মষকারিণো যুষ্মান্ কৃপণোঽহং বদামি কিম্। অর্থাৎ আমি নিজেই কৃপার পাত্র, অতএব পাপকারী তোমাদিগকে আর কি বলিব। এইরূপ ভাবনার দ্বারা আমি হৃদয়ের বিশুদ্ধতা লাভ করিতে লাগিলাম।

এই সময় আমি আর একবার পরীক্ষা দিই, কিন্তু তাহাতে যে কারণে বিফল হই, তাহা লিখিতে কিছু লজ্জা হয়। প্রত্যহ একই প্রকার আহার করাতে মধ্যে মধ্যে আমার দেশের আহার্য্যের কথা মনে উঠিত। কিন্তু আমি তাহার দমনে বিশেষ যত্ন করিতাম না। সেবারকার পরীক্ষায় বাহ্যজ্ঞান বিলোপ হইবার পর দেখিলাম—যেন আমি এক নগরের ভিতর ভিক্ষা করিবার জন্য যাইতেছি। একটী গৃহ হইতে এক স্থূলোদর বেণিয়া আমাকে ডাকিল। নিকটে যাইলে সে আমাকে বলিল “বাবাজি, ভিক্ষা করিবে?” আমি বলিলাম “যদি করাও, তবে করি।” সে বলিল “তবে এস।” এই বলিয়া আমাকে তাহার বৃহৎ বাটীর মধ্যে ঠাকুর-বাড়ীর দিকে লইয়া গেল। সেখানে বসাইয়া সে ঠাকুরের প্রসাদ দিতে বলিল। বেণিয়াটী বল্লভাচারী; সেদিন তাহার ঠাকুরকে পূরা বাহান্ন প্রকার ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। দুই তিন জন লোক তাহা ক্রমশঃ আমাকে পরিবেষণ করিয়া দিল। তাহা দেখিয়া আমার অতিশয় হর্ষ হইল। মনে হইল বহু দিন এ সব দ্রব্য খাই নাই, আজ খুব খাইয়া লই। এই মনে করিয়া আমি খাইতে লাগিলাম। ইচ্ছা, বাহান্ন রকমই খাইব। কিন্তু বর্‌ফিটা ভাল হওয়াতে তাহারই অনেকখানি খাইয়া ফেলিলাম। সেইরূপ

লাড্ডু, রাব্‌ড়ি, কচুরি, তরকারী প্রভৃতি বেশী বেশী খাইয়া ফেলিলাম। শেষে বুঝি আর বাহান্ন রকমের সব হয় না। তবুও অল্প অল্প চলিল। শেষে উঠিবার সময় আর উঠিতে পারি না। কি আপদ্! হস্ত পদ যেন নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। পরে সংজ্ঞালোপ; তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিঘাত পাইয়া জাগরণ।

এই 'দৃষ্টিতে' আমার দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। মনে করিলাম আমার ভিতর "ফলারে বামুণত্ব' এখনও এত রহিয়াছে! শেষে চিন্তা করিলাম, 'পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থানমিত্তকম্'। বস্তুতঃ জিহ্বা ও উপস্থ নিবৃত্তিমার্গের দুই সমতুল্য অন্তরায়। পরে বিচার করিয়া দেখিলাম, **বাহ্যসম্পদাকাঙ্ক্ষা, জিহ্বা** ও **উপস্থ,** এই তিনই নিবৃত্তিমার্গের প্রধান অন্তরায়। তত্তদ্বিষয়ক স্পৃহাকে **আন্তরিক** ও **অকপট** ভাবে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা না হইলে নিবৃত্তিমার্গে গমনের অধিকার হয় না। যেমন ইতস্ততঃ তপ্তাঙ্গার-বিক্ষিপ্ত স্থানে গমন করিবার সময় লোকে প্রতিপদে সাবধান হয়, সেইরূপ প্রতি চিন্তায় ও কার্য্যে অবধানযুক্ত হওয়া উচিত। যদি প্রত্যেক উদ্যমই ঐ তিনপ্রকার স্পৃহাত্যাগের অবিরোধী হয় ও অশক্তি বশতঃ স্পৃহার অনুকূল কোন উদ্যম করিলে তাহাতে যদি অনুতাপ হয়, তবেই তাহা অকপট ত্যাগেচ্ছা।

ইহার পর আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি আর কোনপ্রকার লোভের দ্রব্য পাইলেও খাইব না। শাস্ত্রে যে 'ঔষধবদশ্নীয়াৎ' অর্থাৎ ঔষধ সেবনের ন্যায় ভোজন করিবে এইরূপ বিধি আছে ও বৌদ্ধগণ যে 'পরিজ্ঞাত' বা সুখ-দুঃখ-শূন্য ভোজন বলেন, আমি তাহা চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভোজনের সুখ স্মরণপূর্ব্বক 'তাহা আমি চাই না' বলিয়া তীব্র ইচ্ছা করিতে লাগিলাম। যখন ভোজন করিতাম, তখন সেই আহার্য্য আহুতি স্বরূপ হইয়া, তদ্দ্বারা পুষ্ট প্রাণ পরমাত্মার

দিকে নিয়োজিত হউক, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আহার করিতাম। শেষে স্থির করিলাম, সমস্ত লোভজনক ভোজ্য আমার কাছে নিষিদ্ধ অন্ন।

আর ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়েও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম। স্বার্থে বা পরার্থে কিছুতেই তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইব না। ক্ষুদ্রার্থের জন্য পরমার্থকে ত্যাগ করিব না। প্রথম পরীক্ষায় যেরূপ ভাবে সেই স্বর্ণতালে পদাঘাত করিয়াছিলাম, যাবতীয় বাহ্য সম্পদের প্রতিও সেই ভাব আনয়ন করিতে লাগিলাম।

অনেক দিন এইরূপ সাধন করিতে থাকাতে আমার হৃদয় ক্রমশঃ শান্ত হইতে লাগিল। ঈশ্বরপ্রণিধানে মধ্যে মধ্যে এরূপ আনন্দ হৃদয়ে উথলিয়া উঠিত যে, আমি যেন কৃতার্থ হইয়া যাইতাম। সেই আনন্দ-ভোগ কালে অজস্র অশ্রুপাত হইত। আমি শোকাশ্রুর ও আনন্দাশ্রুর ভেদ বুঝিলাম। আত্মজয়ে ক্রমশঃ সাফল্যলাভে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নির্জ্জনতা (যাহা পূর্ব্বে সময়ে সময়ে অসহ্য হইত) সুখকর বোধ হইতে লাগিল। ঈশ্বর-আরাধনায় যে আমার অর্থ-সিদ্ধি হইতেছে, তাহা জানিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বে আমার মনে সংশয় হইত যে, ঈশ্বর যদি পুণ্য-পাপ কর্ম্মের ফলদাতা হন, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। তাহা হইলে তাঁহাকে নিত্য তৎকার্য্যে ব্যাপৃত সুতরাং অশান্তচেতা ও নিষ্করুণ কল্পনা করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সাধারণ লোকদের কল্পিত ঈশ্বরের এই দুই কার্য্য দেখা যায়, যথা—যে তাঁহার খোসামোদ করিতেছে, তিনি তাঁহাকে স্বর্গে তুলিতেছেন; আর যে তাহা না করিতেছে, তাঁহাকে তিনি নরকে ফেলিতেছেন। নদীজল গড়াইয়া যাইতেছে, কেহ আর মনে করে না যে ঈশ্বর তাহা ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছেন। সেইরূপ বায়ুপ্রবাহ, ঋতু-পরিবর্ত্তন, গ্রহ-নক্ষত্রের

সঞ্চার প্রভৃতিও স্বাভাবিক-শক্তি-বশে হইতেছে বলিয়া প্রায় লোকে অধুনা জানে। তবে মূলে তাঁহার অধীশত্ব স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

সাংখ্যশাস্ত্র হইতে জানিয়াছিলাম, ঈশ্বর কর্ম্মফলদানের জন্য সাক্ষাৎকর্তৃত্ব অভিমান না করিলেও সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মে কর্ম্মের ফল-প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু ইহাতে আমার সংশয় হইত; কারণ, তাঁহাকে ডাকিয়া আমি অনেক সময়ে অনেক ফল পাইয়াছি।

এই সংশয় এখন আমার একেবারে মিটিয়া গেল। আমি তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে কখন কখন তন্ময় হইয়া যাইতাম। তখন বোধ হইত, আমি যেন তাঁহার ভিতরে ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছি। যেরূপ অগ্নিতে লৌহ দিলে উষ্ণতা লৌহে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ তাঁহার ঈশ্বরতা যেন আমার ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। সেই সময় আমার ইচ্ছাশক্তি এরূপ নির্ম্মল ও দৃঢ় হইত যে, আমার বোধ হইত যেন আমি অনায়াসেই হৃদয় হইতে সমস্ত প্রবৃত্তির বীজ উৎপাটিত করিতে পারি। এইরূপে আমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইতে লাগিল। আমার তখন কোন বাহ্য অভাব ছিল না; একমাত্র অভীষ্ট ছিল যে, অন্তরের কুপ্রবৃত্তি সকল দমিত হয়। অতএব আমার সেই অভীষ্ট সফল হইতে লাগিল।

ইহাতে আমি বুঝিলাম, ঈশ্বরধ্যানে কিরূপে অভীষ্টসিদ্ধি (স্বাভাবিক নিয়মেই) হয়। ঈশ্বরতা অর্থে অব্যর্থ শক্তি বা ইচ্ছার অনভিঘাত। সেই ঈশ্বরতা চিন্তা করিতে করিতে আমাদের ভিতর তাহা অনুপ্রবিষ্ট হয়। তজ্জন্যই সাধকগণ তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে, তাঁহাদের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশভাব আবির্ভূত হয় ও তাঁহারা আপনাদিগকে ধ্যেয় ঈশ্বরের সহিত এক বোধ করেন। ঈশ্বর-ভাবের কতক অনুপ্রবেশ হওয়াতে আমাদের ভিতর সাত্ত্বিকতা ও শক্তি প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের

অভীষ্ট সিদ্ধ করে। অবশ্য, যে যতদূর সেই ভাব আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার ততদূর শক্তি ও সাত্ত্বিকতা প্রকাশিত হয়।

এইরূপে আমি দেখিলাম যে, কর্ম্ম হইতেই সমস্ত হইতেছে। ঈশ্বর-উপাসনাও একপ্রকার কর্ম্ম। ঈশ্বরকে আমাদের আদর্শ-স্বরূপ দেখিলাম। তাঁহাকে আদর্শ বা লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম সহজেই সিদ্ধ হয়। তাহাতে তিনি যে শান্তিপদে বিরাজমান আছেন, আমাদেরও তাহা লাভ হয়। কর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক শাস্ত্রীয় নিয়মের তত্ত্বও আমি অবগত হইলাম। কিন্তু সে সব এখানে লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। বস্তুতঃ সেই সমস্ত গূঢ় স্বাভাবিক নিয়মের জ্ঞানাভাবেই আমরা ঈশ্বরের উপর কর্ম্মফল-দানাদি নানাপ্রকার কর্ত্তৃত্ব আরোপ করি। পরম পুরুষ পরমেশ্বর যে কর্ম্মাতীত, তাহাই শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম প্রভৃতি দেবতারাই সৃজন, কর্ম্মফল দান আদি কার্য্য করেন বলিয়া বর্ণিত হন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরীক্ষা ও সফলতা।

এইরূপে আমি কয়েক মাস সাধনে ব্যাপৃত রহিলাম। মনে করিলাম, এবার নিশ্চয়ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপরে যাইব।

এই সব বিষয়ে ব্যাপৃত থাকাতে আমি সময়ের হিসাব রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তথায় শীত গ্রীষ্ম ছিল না, তবে সূর্য্যের নিম্নতা ও রাত্রির আধিক্য দেখিয়া জানিয়াছিলাম যে, সে সময় অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাস। কতদিন গত হইতেছে, তাহা স্থির করিবার জন্য আমি জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।

প্রথমতঃ ক্যাসিওপিয়া নামক তারাপুঞ্জ এবং এণ্ড্রোমিডার উজ্জ্বল

তারার (Alpheratএর) মধ্যস্থ রেখা হইতে বিষুবক্রান্তি বিন্দু বা Vernal equinox এবং তাহা হইতে সূর্য্যের দূরতা মান করিয়া সূর্য্যের দ্রাঘিমা• বা Right ascention স্থির করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু যন্ত্রাদি না থাকাতে পরিমাণ-ফল আন্দাজী হইল। তাহাতে অগ্রহায়ণ কি পৌষ, তাহা স্থির হইল না। অন্ততঃ যদি ভূমিতে প্রোথিত এক লম্ব শঙ্কু পাইতাম, তাহা হইলেও সব স্থির করিতে পারিতাম। পরে চিন্তা করিয়া দেখিলাম, যখন সূর্য্যের রশ্মির এখানে বিশেষ প্রয়োজন, তখন প্রাসাদের উভয় পার্শ্বে দুই বেলা সমান রৌদ্র পাইবার জন্য বোধ হয় এই প্রাসাদ ঠিক উত্তর-দক্ষিণে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাসাদের অগ্রভাগে সেই মণিমণ্ডপ এবং মণিমণ্ডপের দ্বার ঠিক মধ্যস্থলে, সুতরাং দ্বারের উভয়পার্শ্বস্থ ভিত্তি (ভিত্তির স্থূলতা) ঠিক যাম্যোত্তর রেখায় থাকিবে। দ্বারের বাহির হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, আমার অনুমান যথার্থ। দ্বার ঠিক যাম্যোত্তর রেখায় বা দক্ষিণমুখে ছিল। পরে দ্বারের ভিত্তিতে সূত্র ঝুলাইয়া দেখিলাম উহা ভূমির উপর ঠিক লম্ব।

প্রাসাদের এই ভাগ দক্ষিণে অবস্থিত থাকাতে আমি প্রত্যহ সূর্য্যাস্ত সময়ে ভিত্তির ছায়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকস্থ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতের উপর দিয়া সূর্য্যাস্ত দেখা যাইত কিন্তু সে স্থানের পর্ব্বত সমোচ্চ থাকাতে পর্য্যবেক্ষণের সুবিধা হইল। যেখানে ছায়া থাকিত, তথায় আমি পেন্‌সিল দিয়া এক দাগ দিতাম। এইরূপে দেখিলাম, সূর্য্য তখনও দক্ষিণে যাইতেছে। পরে ইহা হইতে আমি উত্তরায়ণের দিন স্থির করিয়া খাতায় কালের হিসাব রাখিতে লাগিলাম। (শেষে জানিয়াছিলাম, আমার হিসাবে দুই দিন মাত্র ভেদ হইয়াছে)।

এইরূপে প্রায় ছয় মাস পরে আমি একদিন আবার উপরে উঠিবার জন্য যাত্রা করিলাম। বাহ্যজ্ঞান লোপের পর দেখিলাম—

যেন আমি এক প্রশস্ত রাজপথ দিয়া যাইতেছি। যেন আমি সেই দেশের লোক; সেখানকার অনেকে যেন আমার পরিচিত। সকলেই যেন ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিতে লাগিল "তুমি দেশের সংবাদ জান না? রাজা বিজয়বাহু আমাদের দেশ আক্রমণ করিয়াছে। আমাদের রাজা বিলাসসিংহ রাজপুরীতেই মারা গিয়াছেন। সকল অমাত্যই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। কেবল যাহারা গোপনে বিজয়বাহুকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহারাই পুরস্কৃত হইয়াছে। বিজয়বাহুরই সব লোক উচ্চ ও লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এদেশের লোকের আর ভদ্রস্থতা নাই।"

তাহার পর তাহারা রাজা, অমাত্য ও রাজপুরুষগণের দোষের কথা বলিতে লাগিল। বলিল, "তাহাদের জন্যই আমাদের দেশ গেল। সকলেই কুক্ষিম্ভরি, অবিশ্বাস্য, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, পরশ্রীকাতর ছিল; তাহাতেই আমাদের দেশ ছারখার হইয়াছে।" তাহারা আর এক গ্রামের লোকদের নিন্দা করিতে লাগিল। বলিল, "তাহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে; ইহাতে বিজয়বাহু আরও ক্রুদ্ধ হইবে।" এইরূপ শুনিতে শুনিতে আমি আর এক গ্রামে যাইলাম। দেখিলাম, তথাকার লোকেরা কয়েকজন দুষ্ট রাজপুরুষের শাস্তিতে অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছে। দেশের জন্য কিছুমাত্র কাতর নহে। পরে আর এক গ্রামে যাইলাম। দেখিলাম, অর্দ্ধেক লোক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, আর অর্দ্ধেক ভিন্নমত। দুই দলে অত্যন্ত বিবাদ চলিতেছে। পরে আর এক গ্রামে যাইলাম। তাহারা সকলেই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, কিন্তু তাহাদের নেতা লোভবশতঃ বিজেতার পক্ষে গিয়াছে। তাহারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নেতা পাইতেছে না। তাহারা অনেক যুক্তি দেখাইয়া আমাকে তাহাদের দলে প্রবেশ করিতে ও নেতৃত্ব করিতে বলিল। আমি স্বদেশের জন্য ক্লিষ্ট হইয়া

কি করিব, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। শেষে হঠাৎ আমার মনে হইল, আমি যে নিবৃত্তিমার্গে যাইতেছি। অমনি আমার বিচার আসিল। মনে করিলাম, আমার 'স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্,' আর আমার শত্রু-মিত্রে সমান হওয়া উচিত। অবৈরিতার দ্বারা বৈরিতাকে জয় করা আমার ধর্ম্ম। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, সত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম যে রাজ্যের লোকের অধিক পরিমাণে আছে, তাহাদেরই জয় হয়, কারণ 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'। এ দেশের লোক সামান্যের জন্য অসত্য বলে, পরস্পরের দোষে নিতান্ত অসহিষ্ণু, দেশের অমঙ্গল করিয়াও স্বকীয় শত্রুর ধ্বংসে হৃষ্ট হয়। আর সত্যাদিধর্ম্মশূন্য ধর্ম্মধ্বজিগণ এ দেশে ধার্ম্মিকের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা ধর্ম্মজীবন বা সন্ন্যাসধারণ ভোগসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় হইয়াছে। যাহারা গার্হস্থ্যজীবনে কষ্টে কালাতিপাত করিত, তাহারা যদি সন্ন্যাসজীবনে পূর্ব্বাপেক্ষাও বাহ্য-ভোগ ত্যাগ করে, তবেই তাহাদের সন্ন্যাস প্রকৃত ধর্ম্মার্থ বলিয়া বুঝা যায়; কিন্তু অধুনা গার্হস্থ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভোগসিদ্ধিই সন্ন্যাসের প্রবর্ত্তক হইয়াছে। দেশের ধনিগণ হৃদয়শূন্য, স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণের জন্য দানহীন ও প্রায়শঃ কুক্রিয়াসক্ত এবং জ্ঞানি-গণ প্রায়শঃ আত্মসংযমহীন, অদৃঢ়ব্রত ও নিঃস্ব। বিকাশশীল জ্ঞানের পরিবর্ত্তে নানাবিধ কুসংস্কার আধিপত্য করিতেছে। নানা ধর্ম্ম-মতের জন্য তাহাদের পরস্পরের অবিনাশ্য পার্থক্য ও তজ্জনিত অনৈক্য প্রভৃতি দোষ প্রবল হইয়াছে। এখন প্রত্যেক পদেই অযোগ্য ব্যক্তি স্থাপিত। নির্ভীকের পদে ভীরু, ধার্ম্মিকের পদে অধার্ম্মিক, বিশ্বাস্যের পদে অবিশ্বাস্য বিশ্বাসঘাতক; এইরূপ সমস্ত পদেই অযোগ্য ব্যক্তিগণ ছলে, কৌশলে বা বংশানুক্রমের অনুরোধে প্রতিষ্ঠিত। বুঝিলাম, সেইজন্যই দেশের পরাজয়। ভাবিলাম, যখন পরাজিতগণ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিপূর্ব্বক নিজেদের এক-

শ্রেণীস্থ মনে করিবে, কষ্টে পড়িয়া যখন প্রকৃত ধর্ম্মের চর্চ্চা করিবে, ভণ্ডামির প্রসার যখন কমিবে, আর যখন বিজেতৃগণ সম্পত্তিমদে মত্ত হইয়া অধার্ম্মিক হইবে, তখন আবার পরাজিতগণ বিজয়ী হইবে। ইহাই কর্ম্মের নিয়ম। ধর্ম্মের সংসিদ্ধিই আমার কর্ত্তব্য। তাহা সাধন করিতে পারিয়া যদি জিত ও পরাজিতগণকে ধর্ম্মপ্রবণ করিতে পারি, তবে উভয়েরই মঙ্গল। কারণ, তাহাতে বিজেতাদের উৎপীড়ন কমিয়া যাইয়া পরাজিতেরা সুখী হইবে, এবং বিজেতারাও ধর্ম্মে সুখী হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি সবীর্য্যে চলিতে লাগিলাম, আর কোন দিকে তাকাইলাম না।—পরে আমার ললাটে শীতস্পর্শে আমার সংজ্ঞা হইল। দেখিলাম, আমি উপরে আসিয়াছি। আমার ললাট-দেশ সেই উজ্জ্বল দ্রব্য স্পর্শ করিয়াছে। এক পার্শ্বে সরিয়া যাইয়া দেখিলাম, উহা একটী বৃহৎ ফলক এবং অতি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ। তাহার দিকে চাহিলেই যেন চক্ষু কিরূপ আকৃষ্ট হয়। আমি মেস্মেরিক দর্পণের বিষয় জানিতাম। মনে করিলাম, ইহাও সেইরূপ হইবে; ইহাতে কোনপ্রকারে তাদৃশ জৈব শক্তি হয়ত ধৃত হইয়া রহিয়াছে। পরে আমি সানন্দে ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

'মগ্‌গজীবী আগার' বা সাধন-স্তবক।

সেই স্তবকস্থ হর্ম্ম্যের বিস্তার নিম্ন স্তবকের তিন ভাগের এক ভাগ হইবে। তজ্জন্য সম্মুখে এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ছিল। তাহার চারিদিকে পূর্ব্বোক্ত হস্তনমুনার বেড়া বা রেলিং। নীচে যেমন একটীমাত্র মণিমণ্ডপ, এ স্তবকে ঐজাতীয় কিন্তু বিভিন্ন রকমের তিনটি আছে। এখানেও নীচের মত জল ও আহার্য্যের প্রথা আছে। আমি প্রথমে স্নানাহার করিয়া পরে দর্শন করিব মনে করিয়া স্নান সমাপন করিলাম। কৌপীন ধুইয়া বেড়ার উপর শুকাইতে দিতে যাইলাম। বেড়ার বাহিরে অনেকখানি কাণিসের মত ছিল। তাহার মধ্যস্থলে চিক্কণ, ধাতুর ন্যায় উজ্জ্বল এক নালা বা তাদৃশ কিছু সর্ব্বদিকে ঘিরিয়া ছিল। আমি কৌপীন শুকাইবার জন্য বেড়ার উপর ছুড়িয়া দিলাম। তাহাতে আর্দ্র কৌপীনের এক ধার বেড়া হইতে কিছু দূরে যাওয়াতে আমার এরূপ বৈদ্যুতিক ঘাত লাগিল যে আমি পড়িয়া যাইলাম। কিন্তু সাধারণ বৈদ্যুতিক ঘাত অপেক্ষা তাহার কিছু প্রভেদ আছে। সাধারণ বৈদ্যুতিক ঘাতে পেশী সকল সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু তাহাতে যেন একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল। আমি সুস্থ হইয়া ইহার তত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলাম। আর ধীরবীর্য্যের 'বিতিং পরিবজ্জয়ে' (৫৬ পৃ) কথাও মনে পড়িল। বুঝিলাম, ঐ চিক্কণ নালা হইতে কোন একপ্রকার বৈদ্যুতিক ক্রিয়া বিকিরিত অথবা প্রতিফলিত হইয়া আকাশের দিকে যাইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য এই বোধ হইল যে, সুরঙ্গ ব্যতীত আকাশমার্গ দিয়াও কেহ এখানে যেন আসিতে না পারে। যান্ত্রিক ও ধার্ম্মিক বিভাগের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল, তাহার উপরেও বেড়া

ছিল। ঐ বেড়া উপবন পার হইয়া জলাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকাতে বুঝিয়াছিলাম, এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে যাওয়া যায় না। রাষ্ট্রিক বিভাগে যাইবার জন্য এক সেতু জলাশয়ের উপর ছিল।

এইখানে তথাকার আব হাওয়ার বিষয়ও কিছু বলিতেছি। সেখানে সূর্য্য যত প্রখর হইত, তত অধিক পরিমাণে শীতল পার্ব্বত্য বায়ু বহিত এবং সূর্য্যের প্রখরতার সহিত বায়ুপ্রবাহ কমিয়া যাইত। তাহাতে সেখানকার তাপ প্রায় একইরূপ থাকিত। আর এক দৃশ্য তথায় প্রায়ই দেখা যাইত। দিনে প্রস্তর-প্রাঙ্গণ তপ্ত হইলে তৎ-সংলগ্ন বায়ু ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিত; তখন উপবনের সুন্দর মরীচিকা দেখা যাইত। কখন কখন জলাশয়ের উপর আকাশেও উল্টা মরীচিকা দেখা যাইত। চতুর্দ্দিকে উচ্চ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতে প্রতি-হত হওয়াতে তথায় মেঘ যাইতে পারিত না।

সেই স্তবকের মণিমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেখি, তাহা নিম্নস্থ মণ্ডপ অপেক্ষা অল্পায়তন। তাহার মধ্যস্থলে একটী শুইবার মত মঞ্চ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মণিমণ্ডপ অষ্টভুজ; তাহার পঞ্চভুজ বাহিরে এবং তিনটী ভুজ পশ্চাতের পাষাণভিত্তিতে নিবদ্ধ। তথা-কার মণিমণ্ডপের সেই নিবদ্ধ তিন ভিত্তিতে তিনটী দ্বার আছে। ধীরবীর্য্য বলিয়াছেন বামে "সংকপ্পিত দস্সন আগার" ও দক্ষিণে "খন্ধানং সম্মা সম্বুদ্ধি আগার"। তাঁহার আখ্যা না লিখিয়া আমি যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহা লিখিতেছি। বামের নাম 'দিব্য-দৃষ্টি' ও দক্ষিণের নাম 'তত্ত্ব-দর্শন' আগার ও মণ্ডপমধ্যস্থ মঞ্চের নাম 'মনন-মঞ্চ' হইলে ঠিক নাম হয়। মধ্যের ভিত্তিতে আর এক যে দ্বার ছিল যাহা মণ্ডপদ্বারের ঠিক সম্মুখস্থ, তাহার ভিতর দিয়া তৃতীয় স্তবকে উঠিবার উপায় আছে। ধীরবীর্য্য এ স্তবকের বিষয় বিশেষ কিছু বলিয়া যান নাই। পরে আমি জানিয়াছিলাম, এই সাধন-

স্তবকে যাহারা সাধন করিবে, তাহাদের সহায়তার জন্য এই সমস্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমে আমি এই সকল স্থানের বিবরণ দিয়া পরে তাহাতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিব।

১। মণিমণ্ডপের মধ্যস্থ মনন-মঞ্চের উপরিভাগস্থ ছাদ, যাহা কটাহের মধ্যস্থান, তাহা কৃষ্ণবর্ণ ও মুকুরের মত মসৃণ ও চিক্কণ। মঞ্চের উপর বসিলে মস্তকের ভিতর যেন একপ্রকার শীতল বোধ আসে, পরে মনে যে বিচার আসে, তাহা অতি পরিষ্কার ও তলস্পর্শী হয়।

২। বাম ও দক্ষিণের দুই আগার সম্পূর্ণ গোলাকৃতি অর্থাৎ ফাঁপা বলের মত। দ্বার হইতে এক পাতলা প্রস্তরফলক গোলের ঠিক শূন্যস্থ কেন্দ্রস্থানে গিয়াছে। তাহার অগ্রভাগ কিছু আয়ত ও চক্রাকৃতি (কতকটা লুচি-ভাজা ছান্‌নার মত)। উহাই ঐ আগারের আসন। দুই আগারের ভেদ এই যে, বাম আগার রক্তাভ, আর দক্ষিণ আগার উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ। তথায় বসিলে যাহা হয়, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে।

৩। তৃতীয় বা সর্ব্বোচ্চ স্তবকের পথ একটী খাড়া নলের মত। তাহার ভিত্তি-গাত্রে শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্ত বর্ণের তিন রেখা জড়াইয়া জড়াইয়া উপর পর্য্যন্ত গিয়াছে। উহাতে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেন এক বৃহৎ Solenoidএর ভিতর আসিয়াছি। মেঝের মধ্যস্থলে এক চক্রাকৃতি আসন ছিল; তাহা একটী অনতিস্থূল দণ্ডের উপর স্থাপিত। দণ্ডটি মেঝের ভিতর গর্ত্তে চলিয়া গিয়াছে। সেই কূপাকার উচ্চ মার্গের উপরিভাগ এক স্বচ্ছ আবরণে আবৃত। আসনের চতুর্দ্দিকে স্বর্ণবর্ণ এক উচ্চ বিট ছিল। প্রথমে আমি উপরে উঠা যায় কি না, দেখিবার চেষ্টা করিলাম। বুঝিলাম, ঐ আসনে উপবেশন করিলে কোন কারণে তাহা উপরে উঠিতে থাকে।

তখন বোধ হয় উপরের স্বচ্ছ আবরণ সরিয়া যায়, তাহাতে উপবিষ্ট ব্যক্তি উপরে যাইতে পারে। এই ভাবিয়া আমি আসনে বসিলাম। তাহাতে আসন কিছু নাবিয়া গেল। কিন্তু সাশ্চর্য্যে দেখিলাম, আমার শরীর বিশেষতঃ হস্তপদাগ্র হইতে অজস্র বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া সেই আসনের হেমবর্ণ কিনারায় যাইতে লাগিল। আসন বিন্দুমাত্র উঠিল না। আমি অনন্যোপায় হইয়া ঈশ্বরের চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাহাতে যেন বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ কিছু কম বোধ হইল। কিন্তু তবুও আসন উঠিল না।

ইহার তত্ত্ব শেষে যাহা স্থির করিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি। প্রত্যেক চিন্তাতে আমাদের শরীরে বিশেষতঃ স্নায়ু (Nerve)-সমূহে বৈদ্যুতিক প্রবাহ হয়। ভিত্তিগাত্রস্থ কোন শক্তিবিশেষে সেই বৈদ্যুতিক ক্রিয়া পরিবর্ত্তিত ও অত্যুত্তেজিত হইয়া আসনপরিধির হেমবর্ণ পরিচালক অংশে আকৃষ্ট হইয়া যাইতে থাকে। তাহা পুনশ্চ নিম্নস্থ উত্তোলক দণ্ডে যাইয়া কোন কারণবিশেষে (সম্ভবতঃ বিদ্যুৎঘটিত কোনপ্রকার আকর্ষণে) দণ্ডকে উপরে উঠিতে দেয় না। চিন্তা ও শারীরিক ক্রিয়াকে সম্যক্ রোধ করিতে পারিলে তবে ঐ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ নিবৃত্ত বা পরিবর্ত্তিত হয়। তখন আসন উপরে উঠিয়া থাকে। ইহাতে বুঝিলাম, নিরোধ-সমাধি অভ্যস্ত না হইলে উপরে উঠিবার উপায় নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মনন-মঞ্চ — একাগ্রভূমিকা ও সমাধি-সাধন।

পরে আমি মনন-মঞ্চে বসিয়া মনন করিতে লাগিলাম। এই মঞ্চে প্রত্যহ বসা যাইত, কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা থাকিলে একপ্রকার

ক্লান্তি বোধ হওয়াতে নাবিয়া পড়িতে হইত। প্রথমে আমি সাধন বিষয়ে কর্ত্তব্য-নিরূপণের জন্য মনন করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তথায় বসিলে মস্তিষ্কে একপ্রকার শীতলতা আসিত; তাহাতে চিন্তা স্থির, বহুধারণাযুক্ত ও পরিস্কৃত হইত। যোগশাস্ত্র আমার অধীত ছিল বটে, কিন্তু সেখানকার ন্যায় তাহার তাদৃশ মনন কখনও হয় নাই। ইহাতে আমি সাধনের দুই ভাগ স্থির করিলাম; প্রথম—একাগ্রভূমিকার অভ্যাস, দ্বিতীয়—সমাধি-সাধন।

যোগশাস্ত্র ও গুরুর নিকট হইতে একাগ্রভূমিকার বিষয় জানিয়াছিলাম। এখন তাহার সাধন করিতে লাগিলাম। একাগ্রভূমিকা ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান হইতে পারে না। যে অবস্থায় চিত্তকে অহোরাত্র—শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে, আসনে বা কর্ম্মে—একবিষয়ক রাখা যায়, তাহাকে যোগিগণ একাগ্রভূমিকা বলেন। অহোরাত্র এক বিষয়ে মন রাখিবার ক্ষমতা হইলে তাদৃশ চিত্তে তত্ত্ববিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তাহাও অহোরাত্র মনে জাগরূক থাকে, কখনও বিপ্লুত হয় না; সুতরাং তাহাই প্রকৃত প্রজ্ঞা। এই সাধনের জন্য, আমি ঈশ্বরে যে তন্ময় ভাবের অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা নিরন্তর স্মৃতিপথে উদিত রাখিতে লাগিলাম। আমাদের মনের সাধারণতঃ ত্রিবিধ কার্য্য দেখা যায়। যথা,—বিষয়গ্রহণ, বিষয়-ধারণ ও বিষয়চিন্তন। নিয়তই এই তিন কার্য্য চলিতেছে। শয়ন, ভ্রমণ, উপবেশন প্রভৃতি সর্ব্ব অবস্থায় আমাদের চিন্তন চলে। প্রথমতঃ সেই চিন্তাকে শুদ্ধ বা একাগ্র করিবার জন্য সাধন করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, সর্ব্বদা যে অসংখ্য ব্যর্থ চিন্তা বা বিতর্কজাল উঠে, তাহা আর করিব না। মনকে যেন সম্মুখে রাখিয়া তাহাতে কোন সংকল্প ও কল্পনা আসিতে দিতাম না। কেবল সেই প্রসন্ন ঐশ্বরিক ভাব উদিত রাখিতাম। এই স্তবকের প্রাঙ্গণে ডিম্বাকার কৃষ্ণবর্ণ

রাস্তার মত দাগ ছিল। আমি উহাতে ভ্রমণের সময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভ্রমণ করিতাম। প্রতি পদক্ষেপে সেই ভাব স্মরণ করিতাম। সঙ্কেত করিয়াছিলাম যে, পদক্ষেপ করিলেই সেই ভাব স্মরণ করিতে হয়। সেইরূপ কোন শব্দস্পর্শাদি জ্ঞান হইলেও সেই ভাব স্মরণ করিব, এরূপও সঙ্কেত করিয়া সেই ভাবের স্মৃতিকে নিরন্তরা করিতে চেষ্টা করিতাম। 'আমার কোন অভাব নাই'—ইহাই চিন্তাগত সুখের (যাহা গৃহ্যমাণ শারীরিক সুখ হইতে ভিন্ন) কারণ। সুতরাং বহুক্ষণ সংকল্পশূন্য ভাবে—অর্থাৎ আমি কিছু চাই না, এইরূপ ভাবে—স্থিতি করিতে থাকায় আমার মন স্বাধীনতা-জনিত অনির্ব্বচনীয় স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে আপ্লুত হইত। কিন্তু অবশ্য সব সময় ঠিক পারিতাম না। মন ক্লান্ত হইয়া যাইত। আমি জানিতাম, ব্যায়ামের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ইহা বাড়াইতে হইবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতাম। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বৃত্তির আবর্ত্তন হইবেই জানিয়া সত্ত্বের ভোগকাল ক্রমশঃ বাড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ চিত্তে প্রসাদ থাকিত, পরে বিক্ষেপ আসিত; সেইরূপ কতক দিন বেশ কার্য্য চলিত, পরে কতক দিন মন্দভাবে চলিত; কিন্তু আমি উদ্যম করিয়া ভালর ভাগ বাড়াইতে লাগিলাম। প্রথম প্রথম জাগ্রদবস্থায় অধিক উদ্যম করিলে স্বপ্নাবস্থায় প্রতিক্রিয়াবশে সদ্বিষয়ের স্মরণ মোটেই থাকিত না। এক দিন দিবাভাগে অপেক্ষাকৃত কিছু অল্প পরিমাণ উদ্যম অনুষ্ঠিত হওয়াতে স্বপ্নে সেই প্রসন্ন ঐশ্বরিক ভাব উদিত হইল ও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী রহিল। স্বপ্নকালেও আমার আত্মস্মরণ হইল। বোধ হইল, আমি স্বপ্নে আছি, এখন খুব তন্ময় হইয়া তাঁহাকে চিন্তা করি। ইহাতে আমি বুঝিলাম, উচ্চ সাধকগণ কিরূপে স্বপ্নেও আত্মবিস্মৃত হন না। শরীর ধারণ করিলে কতক সময় নিদ্রা না হউক, অন্ততঃ স্বপ্নের প্রয়োজন হয়; কিন্তু একাগ্রভূমি-

জয়িগণের সেই স্বপ্নও একাগ্র স্বপ্ন হয়। এই সময় আমি নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা নিজেকে উৎসাহিত করিতাম :—

"শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা, স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ।
সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ, স্যান্নিত্যতৃপ্তোঽমৃতভোগভাগী ॥"

(যোগদর্শন, ২।৩২ সূত্রের ভাষ্য।)

অর্থাৎ শয্যা-স্থিত, আসন-স্থিত বা পথে যাইতে যাইতে আত্মস্থ ও পরিক্ষীণ-চিন্তাজাল হইয়া (সাত্ত্বিক স্মৃতির দ্বারা) মোহরূপ সংসার-বীজের ক্ষয় দর্শন করিতে করিতে নিত্য-তৃপ্ত ও অমৃত-ভোগের ভাগী হইবে।

এইরূপে প্রায় তিন মাস আমি সাধনে ব্যাপৃত রহিলাম। শুদ্ধ যে একাগ্রভূমিকার সাধন করিতাম, তাহা নহে; প্রাতে ও সন্ধ্যায় সমাধিরও সাধন করিতাম। সমাধি-সাধনে চিন্তনের ন্যায় বিষয়-গ্রহণকেও রোধ করিতে হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ তিনেরই কার্য্য রোধ করিতে হয়। তাহা অবশ্য চলিয়া ফিরিয়া হয় না। তাহা অতি স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া করিতে হয়। অবশ্য সেই সব গূঢ় বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়, তাহা সাধারণের বোধগম্য ও রুচিকর হইবে না। তজ্জন্য তাহা সংক্ষেপে বলিব। অনেকক্ষণ স্থিরভাবে প্রযত্নশূন্য হইয়া উপবেশন করাতে বোধ হইত যেন ভূমির সহিত আমার শরীর জমিয়া গিয়াছে। যাহাকে সাধারণতঃ গা ছাড়িয়া দেওয়া বলে, তাহারই নাম নিষ্প্রযত্ন ভাব। চিন্তার ও শরীরের সেই নিষ্প্রযত্ন স্থির ভাবের সহিত শ্বাস, প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, শারীর-বোধ প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণকার্য্য ও ইন্দ্রিয়-কার্য্য মিলাইয়া তাহাও স্থির করিয়া, সেই পরম সাধন সাধিতে হয়। অবশ্য আমি তাহাতে অল্পই অগ্রসর হইয়াছিলাম। তবে বুঝিয়াছিলাম যে, তাহা কতদূর উচ্চ ও আমি তাহা হইতে কত দূরে।

শুধু যে শরীর স্থির, প্রাণশূন্যের মত হইলেই সমাধি হয়, একথা

মনে করা নিতান্ত ভ্রান্তি। পরচিত্তজ্ঞতার (Thought-reading) মত কাহারও কাহারও স্বাভাবিক এরূপ শক্তি থাকে যে তাহারা হৃৎপিণ্ডকে স্থির ও শরীরকে মৃতবৎ বা Cataleptic করিতে পারে। কর্ণেল টাউনসেণ্ড নামক একজনের ঐরূপ শক্তি ছিল। তাহা আমি অনেক স্থলে পড়িয়াছিলাম। এ দেশেও যোগী নামে খ্যাত কোন কোন ব্যক্তির ঐরূপ শক্তি আমি দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। তন্মধ্যে হয়ত কেহ কেহ পাঁচ সাত দিন মাটিতে প্রোথিত হইয়া থাকিতে পারে। হিষ্টিরিক (বায়ু) প্রকৃতির কোন কোন লোকের প্রবল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসেও ঐরূপ মৃতবৎ ভাব হয়; আর হঠযোগের প্রক্রিয়া-বিশেষেও হইতে পারে।

কিন্তু উহা সমাধি নহে। হরিদাস যোগী তিন মাস প্রোথিত থাকিয়া উঠিলে বলিত, সে যেন অন্য এক লোকে গিয়াছিল এবং তথায় কত কি বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়াছে। ইহাতে জানা যায়, তাহার চিত্ত সে সময় স্থির ছিল না। অতএব শুদ্ধ শরীরকে মৃতবৎ করিলেই চিত্ত স্থির হয় না, বরং অদান্ত, অশান্ত মন অনায়ত্ত হইয়া স্বপ্নাবস্থার ন্যায় অধিকতর চঞ্চল হয়। বস্তুতঃ শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের চরম স্থিরতার নাম সমাধি। শরীরেন্দ্রিয়ের স্থিরতাপূর্ব্বক যখন ধ্যাতা নিজকে ভুলিয়া কেবল সেই ধ্যেয় বস্তুরই বিদ্যমানতামাত্র উপলব্ধি করিতে থাকেন, তখন তদবস্থাকে সমাধি বলে। ইচ্ছাপূর্ব্বক স্থৈর্য্য অভ্যাস করিতে করিতে ইহা সিদ্ধ হয় বলিয়া, সিদ্ধ ব্যক্তির এই অবস্থায় যাওয়া না যাওয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। সমাধিসিদ্ধিতে জ্ঞান ও শক্তির* সীমা থাকে না। কিন্তু শরীরমাত্রকে মৃতবৎ করিলে

* একজন আজকালকার 'জ্ঞানী' সাধুর (অর্থাৎ যাহারা আত্মসংযমে কিছু করে না, কেবল মুখে জ্ঞানের কথা বলিয়া বেড়ায় তাদৃশ) সহিত আমার সমাধি ও সিদ্ধির কথা হইয়াছিল। সে আমাকে নিম্নলিখিত গল্প বলিল—

সামান্য ক্লেয়ারভয়েন্টের (Clairvoyant) মত কিছু ক্ষমতা হইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য কিছু হয় না। যাহা হউক, এইরূপে আমি সাধন করিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা আসিয়া বিক্ষেপ উৎপাদন করিত। মনে হইত—আমি এই নির্জ্জন স্থানে একাকী আছি, এখানে যদি আমার কোন রোগ হয়, তবে কি করিব। তখন একটু জল আনিয়া দিবার কেহ থাকিবে না; হয়ত বিনা শুশ্রূষায় কষ্টে মরিব ইত্যাদি নানাপ্রকার ভবিষ্যৎ চিন্তা আসিত। ইহাতে মনকে প্রবোধ দিতাম—অশেষ অনাগত দুঃখ ত আছেই, কিন্তু তাহার শঙ্কাতেই যদি কালক্ষেপ করি, তবে কখনই তাহার নিবৃত্তি হইবে না। বর্ত্তমানে ত আমার কিছুমাত্র বিঘ্ন নাই। অতএব এই সময়ে কেন বৃথা ঐ সমস্ত চিন্তা করিয়া

"একজনের তপস্যা করিয়া জলের উপর দিয়া গমন করা-রূপ সিদ্ধি হইয়াছিল। সে বাটীতে ফিরিয়া আসিলে তাহার ভ্রাতা বলিল "তুমি এত কাল তপস্যা করিয়া কি পাইলে?" সে নিজের সিদ্ধির কথা বলিল। তাহার ভাই বলিল "চল দেখি, নদীতীরে যাইয়া তোমার সিদ্ধি দেখাও।" সে তথায় যাইয়া নদীর উপর দিয়া চলিয়া গেল। তাহার ভ্রাতাও খেয়া নৌকায় পার হইয়া গেল। পরে মাঝিকে অর্দ্ধ পয়সা দিয়া ভ্রাতা বলিল 'এই দেখ তোমার এই সিদ্ধির মূল্য অর্দ্ধ পয়সা মাত্র।' এই বলিয়া সেই 'জ্ঞানী' খুব বাহাদুরী করিল। আমি জানিতাম, মুমুক্ষু যোগিগণ সিদ্ধিকে তুচ্ছ দেখেন; কিন্তু এই ব্যক্তির কথায় আমার শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের গল্প মনে পড়িল। ভাবিলাম—এই ব্যক্তি এক পয়সা পাইলে তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে গ্রহণ করে, কিন্তু এই বিষয় ইহার সম্যক্ অপ্রাপ্য বলিয়া এরূপ বাহাদুরী করিতেছে। আমি বলিলাম "তুমি ঐ গল্পের শেষভাগ জান না। শুন বলিতেছি--ফিরিবার সময় পুনশ্চ ভাই নৌকায় ও সিদ্ধ জলের উপর দিয়া চলিয়া আসিতে লাগিল। নদীর মাঝামাঝি আসিলে নৌকায় সহসা ছিদ্র হইয়া তাহা ডুবিয়া গেল। ভাই তখন জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে ত্রাহি ত্রাহি বলিতে লাগিল। তখন সিদ্ধ যাইয়া তাহাকে উদ্ধারপূর্ব্বক তীরে আনিয়া বলিল 'ভাই, তুমি আমার সিদ্ধিতে প্রাণ পাইলে; এখন বল দেখি তোমার প্রাণের মূল্য কত, আর আমার সিদ্ধিরই বা মূল্য কত?" তাহার ভাই বলিল 'আমি পূর্ব্বে বুঝি নাই; তোমার সিদ্ধি অমূল্য।' ফলতঃ পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মই প্রবর্ত্তয়িতার অলৌকিক শক্তির উপর স্থাপিত।"

সাধনের বিঘ্ন নিজেই উৎপাদন করি। এই সময় যদি সর্ব্বান্তঃকরণে সাধন করি, তবে অনাগত দুঃখের প্রকৃত প্রতিকার হইবে। চিন্তা করিলে মন্দ ব্যতীত ভাল হইবে না। এইরূপে মনকে প্রবোধ দিয়া প্রায় তিন মাস সাধন করিয়া দিব্য-দৃষ্টি আগারে এক দিন প্রবেশ করিলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দিব্য-দৃষ্টি—দেশ ও কালের অমেয়তা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই আগার গোলাকার (ফাঁপা বলের ভিতরের মত)। তাহার কেন্দ্রস্থানে শূন্যে বসিবার আসন। তাহাতে বসিলে কিয়ৎকালের জন্য সমাধি হইয়া যে বিষয় অভীষ্ট, তাহার অলৌকিক প্রত্যক্ষ (৫৭ পৃঃ) হয়। এখানে আমি কেবল দুইবার বসিয়াছিলাম। পরীক্ষায় বুঝিয়াছিলাম, এখানে একমাসের কমে পুনশ্চ বসা যায় না, বসিতে গেলে উৎস্বপ্নের (Nightmare) মত কষ্ট হয়। আর এখানে এক বিষয়ের দুইবার দর্শন হয় না। তাহার কারণ এই বুঝিয়াছিলাম যে, মন ও মস্তিষ্কের এক অংশে তত্রত্য শক্তি একাধিক বার ক্রিয়া করে না।

ব্রহ্মাণ্ড সকল ও লোক সকল কিরূপ, তাহা দেখিবার ইচ্ছা করিয়া আমি প্রথমবার বসি। বসিবামাত্র আমার বোধ হইল যেন আমি চতুর্দ্দিক হইতে অতি কোমল দ্রব্যের দ্বারা অচল, অটল ভাবে স্বচ্ছন্দে বিধৃত হইয়া আছি। 'আমার কোন প্রযত্নের আবশ্যক নাই'—এরূপ বোধ হইয়া আমার প্রাণ মন সমস্ত নিশ্চল হইয়া গেল।

এবং মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া যেন এক জ্যোতি* মস্তিষ্কের ভিতর, সেখানে জ্ঞাননাড়ীর মূল (Sensorium), তথায় আসিল। তখন আমার ইন্দ্রিয়-শক্তিসমূহও ভিতরে যাইয়া তথায় এক বৃহৎ জ্যোতি-র্ম্ময় অবকাশে স্থির হইল। সেই জ্যোতির যেন শেষ নাই। তদ্দ্বারা আমি দেখিতে লাগিলাম। সেই দেখা যেন নিজের আলোকে দেখা; সাধারণ প্রতিফলিত আলোকে দেখার মত নহে; তজ্জন্য তাহাতে অন্ধকারস্থ বা আলোকস্থ সমস্ত দ্রব্যই সমান জানা যায়। আর সেই সময়ের দৃষ্টির প্রসার (Field of vision) এত বিস্তৃত অথচ বিশেষদর্শী যে, আমি যেন সমগ্রকে ও তাহার অংশকে (Whole and part) একই সঙ্গে দেখিতে লাগিলাম। আর তখনকার জ্ঞানপ্রবাহ এত দ্রুত হইতে লাগিল যে, সাধারণ জ্ঞানের তুলনায় তাহা উল্কার মত বেগবৎ এবং সাধারণ জ্ঞান কচ্ছপের মত মন্দগতি। তজ্জন্য আমি সাধারণ অবস্থায় আসিলে সেই সময়ের বিশেষ জ্ঞান পুনশ্চ সব ধারণা করিতে পারিলাম না। কেবল সামান্যমাত্র ধারণা আছে।

প্রথমে এক বিস্তারে ঋদ্ধি-মন্দির ও পরে এই পৃথিবীটা দেখিলাম। তৎপরে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে, যাহাকে স্থূল দৃষ্টিতে অন্তরীক্ষ বলা যায়, তাহাতে কত বিচিত্র নগ-বন-যুক্ত দিব্য লোক দেখিলাম; পরে সমস্ত সৌর-জগতে ও প্রত্যেক গ্রহে ঐরূপ দেখিলাম। যেমন

* ইহাই সূর্য্যদ্বার বা সৌষুম্ন-জ্যোতি। ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মূলস্থানের প্রকাশ। ইহাদ্বারা দর্শনে আলোক অন্ধকারাদির অপেক্ষা নাই। যে দিব্য-দৃষ্টিতে তাহাদের অপেক্ষা আছে, তাহাকে চান্দ্র-জ্যোতি বলে। উহা ইন্দ্রিয়-দ্বার বা গোলকস্থ ইন্দ্রিয়ের স্বাধীন স্ফূর্ত্তিবিশেষ, কিন্তু ইন্দ্রিয়মূলজয়-সম্বন্ধীয় প্রকাশ নহে।

ধূমকেতু যে দিকে চলে সেই দিকে (অর্থাৎ অগ্রে) তাহার পুচ্ছ নির্গত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক গ্রহ ও সমগ্র সৌর-মণ্ডলের যেন উত্তরদিকস্থ বৃহৎ বৃহৎ পুচ্ছে দিব্য লোক সকল প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত গ্রহাদি গোলকগণ যেন জলাবর্ত্তের মত বোধ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যস্থল অন্ধকারময়। পরে সৌরমণ্ডলের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ কোটি কোটি বিচিত্র বিচিত্র সূক্ষ্ম-লোক-শোভিত মণ্ডল সকল দেখিয়া (তাহাদের বিস্তার মানবীয় ভাষায় অবচনীয়) সমগ্র স্থূল লোককে এক বিশাল কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ দেখিলাম। সমস্তকে এক বৃহৎ আবর্ত্তস্বরূপ বোধ হইল। সমগ্র স্থূল মণ্ডলের ও তদুপরিস্থিত দিব্য লোকের বাহিরে চরম লোক বা সত্য লোক। হ্রদমধ্যে জলাবর্ত্তের ন্যায় তন্মধ্যে স্থূলমণ্ডল অবস্থিত। চরম লোক দেখিয়া আমার উপাস্য ব্রহ্মাণ্ডাধীশ্বরকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। অমনি আমার ধ্যেয় মূর্ত্তি অসীম সৌম্য ও সদ্ভাবে সজীব হইয়া আমার গোচরীভূত হইল। আমার হৃদয়ে তদনুরাগজনিত যে সুখ হইত, তাহা যেন শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাতে আমার অচল পরিষঙ্গ হইল। পরে আমার তন্ময় ভাব হইয়া গেল। পরে সর্ব্বতো-নিরাবরণ, প্রশান্ত-সুধাব্ধি-কল্প, পরমানন্দময়, মহদাত্ম ভাবের (যে ভাবে তাঁহারও চিত্ত সমাহিত) বোধ হইল। পরে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডের অধীশত্বভাব আমার আসিল। তাহাতে আমার হৃদয়প্রদেশের (তামসিক) আমিত্ব প্রসৃত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রময় হইল। বোধ হইল, সেই হার্দ্দ আমিত্ব হইতে নিয়ত শক্তিধারা পাইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ বিধৃত ও অনুজীবিত রহিয়াছে। (ইহা হইতে আমি অনন্ত-নামক ভগবানের তামসী শক্তির ও ভগবানের নাগযজ্ঞোপবীতত্বের তত্ত্ব এবং তিনি কেন বিষ্ণু [ব্যাপী], কেন প্রজাপতি, তাহাও বুঝিয়াছিলাম।) তৎপরে

আমার অন্য ব্রহ্মাণ্ডের দর্শন-বুদ্ধি হওয়াতে সমগ্র এই ব্রহ্মাণ্ড একবারে যেন নিবিয়া গেল; তখন মন শূন্যবৎ বা লীন হইয়া পুনশ্চ আর এক ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র জ্ঞান একবারে উদিত হইল। (ইহাতে জানিয়াছিলাম যে দুই ব্রহ্মাণ্ড অব্যক্তাবস্থার দ্বারা অন্তরিত।) দুই মুষ্টি বালুকাতে যেরূপ সাদৃশ্য, দুই ব্রহ্মাণ্ডেও তদ্রূপ, কিন্তু উভয়ের প্রত্যেক বালুকাকণার যেমন ব্যক্তিগত অসাদৃশ্য আছে, উভয়ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রত্যেক বস্তুরও সেইরূপ ব্যক্তিগত ভেদ আছে। এইরূপ অজস্র ব্রহ্মাণ্ড সকল আমার গোচরীভূত হইতে লাগিল। শেষে বিরক্তি আসাতে আমি দর্শনে নিবৃত্ত হইলাম। অমনি আমার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গার মত চটকা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি আর তথায় বসিতে পারিলাম না; মণিমণ্ডপে আসিয়া মনন-মঞ্চে মনন করিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয় দর্শনের দিন আমি সৃষ্টিক্রম দেখিবার সংকল্প করিলাম। পুরাণে নানা কাল্পনিক আখ্যায়িকার মধ্যে স্থানে স্থানে প্রকৃত আর্ষ উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে আমি জানিয়াছিলাম, "সূর্য্য আপনার কতক তেজ ত্যাগ করিলে সেই পরিত্যক্ত তেজ হইতে এই পৃথ্বী হইয়াছে।" [মার্কণ্ডেয় পুঃ] "উৎপতিত তেজঃপদার্থ ক্রমশঃ তরলত্ব ও সংহতত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূমি হইয়াছে" ইত্যাদি। এই সব ও আরও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছাপূর্ব্বক সে দিন আমি পুনরায় সেই গোলাকার গৃহমধ্যস্থ আসনে বসিতে যাইলাম। অবশ্য আমি উত্তরকাল হইতে পূর্ব্বকালের অবস্থা দেখিয়াছিলাম বলিয়া সমস্তই বিপরীত বা প্রতিলোমক্রমে দেখিয়াছিলাম।

প্রথমতঃ পূর্ব্বের ন্যায় সমাধিদ্বারা আমি সমস্ত পৃথিবীকে সমস্ত বিশেষ দ্রব্য সহ দেখিলাম। পরে তাহাদের সমস্তেরই মধ্যে বিকার বা পরিণাম দেখিতে পাইলাম। পরে এক ক্ষণ বা কালের পর-

মাণুতে তাহাদের যে অণুমাত্র পরিণাম হয়, তাহাও দেখিতে পাইলাম। সেই অণুমাত্র পরিণাম জানিলে তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিণামও নিঃসংশয়ে জানা যায়। আমি পূর্ব্ববর্ত্তী পরিণাম দেখিলাম। পরে সেইরূপে তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী পরিণাম দেখিলাম। কয়েক মুহূর্ত্তে তাহাতে এরূপ কুশলতা জন্মিল যে, আমি একবারে শতবর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পরিণাম দেখিলাম। তাহাতে বোধ হইল যেন বৃদ্ধেরা বালক হইয়া গেল, মহামহীরুহ ক্ষুপবৎ হইয়া গেল ইত্যাদি। পরে এক দৃষ্টিতে পৃথিবীর প্রাণি-ধারণের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত গোচরীভূত হইল। তাহাতে কতপ্রকার সাধারণ ও সলোম মনুষ্য, কত অপূর্ব্ব জন্তু ও উদ্ভিদ্ দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। পরে পর্ব্বতাদি সমস্ত সমতল হইয়া গিয়া ধরা জলময় হইয়া পরে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পরে তাহা চন্দ্রের সহিত মিলিয়া বক্রভাবে যাইয়া সূর্য্যে পড়িয়া মিলাইয়া গেল। পরে সমস্ত সৌর জগৎ ঐরূপ হইয়া আর এক মহা জ্যোতিষ্কে মিশিল। তৎপরে এই সমগ্র স্থূল মণ্ডল এক ভূপ উদ্দীপ্ত ভ্রাম্যমাণ পিণ্ডে পরি-ণত হইল। পরে সর্ব্বব্যাপী নির্ঘোষ সহকারে সমস্ত নিস্তাপ হইয়া গেল। তৎপরে নানাপ্রকার বিশেষ বিশেষ রূপ-গুণাদি আর রহিল না। তখন সমস্ত একাকার দশদিকব্যাপী মহোদধিকল্প হইয়া গেল। তদনন্তর সমস্ত নিবিয়া গেল। আমি যেন ঘোর মোহে মুগ্ধ হইয়া যাইলাম। তৎপরে পুনরায় এই ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্বাভিব্যক্তি গোচর হইল। অবশ্য তাহার লয়কে সৃষ্টি ও তাহার সৃষ্টিকে লয়ের মত দেখাইল; এবং তাহার সমস্ত জীবকে আমি পূর্ব্বের বলিয়া জানিতে পারিলেও তাহাদের আকার, প্রকার, ইন্দ্রিয়াভিব্যক্তি, ভাষা প্রভৃতির সম্পূর্ণ ভেদ দেখিলাম।* তৎপরে আরও দিদৃক্ষা

* অনেকে মনে করে, পূর্ব্ব কল্পে এইরূপ ভাষা ও ব্যক্তি সকল ছিল; কিন্তু

থাকাতে বহু ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বা অতীত অভিব্যক্তি আমার অজস্র গোচর হইতে লাগিল। শেষে বিরক্তি আসাতে পূর্ব্ববৎ চটক ভাঙ্গিয়া গেল ও আমি বাহিরে মণিমণ্ডপে আসিয়া মনন-মঞ্চে শুইয়া পড়িলাম।

তখন আমার মনে এমনি উদার ভাব আসিল যে আমি সমস্ত লোককে, যেমন পর্ব্বতস্থ ব্যক্তি নিম্নস্থকে দেখে, সেইরূপ দেখিতে লাগিলাম। ঐ দুই দর্শন মিলাইয়া মনন করাতে যে কি অভূতপূর্ব্ব ভাব আসিল, তাহা বলিতে পারি না। চিৎ ও অব্যক্ত-রূপ অমেয় পূর্ণ শক্তির যে কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, তাহা কতক বোধ-গম্য হইল। মনন-মঞ্চের প্রভাবে মেধার এত স্ফুর্ত্তি হইল যে, আমি আরও গভীর বিষয় সকল বুঝিতে লাগিলাম। মনে হইল—আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা অল্প একদিক্ মাত্র। যেমন মহত্ত্ব অসীম, তেমনি ক্ষুদ্রতাও অসীম। আমার নিকট ব্রহ্মাণ্ড যেমন বৃহৎ, তেমনি আর এক জনের নিকট আমিও তদ্রূপ বৃহৎ। সেও পুনশ্চ আর এক জনের নিকট তদ্রূপ; এইরূপে পরিমাণের কোন দিকে সীমা নাই; কারণ পূর্ণ শক্তিতে অসম্ভব কিছুই হইতে পারে না। কার্য্য সকলের বিকাশের যদি সীমা থাকে, তবে তাহাদের মূল কারণ কখনও পূর্ণ শক্তি হইতে পারে না। আরও বুঝিলাম, যেমন নানা মণ্ডল লইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড, সেইরূপ নানা ব্রহ্মাণ্ড লইয়া

তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ও আপাতবিষয়ের অভিমানমূলক কল্পনা মাত্র। যখন দেখা যায় ২।৪ সহস্র বৎসরে ভাষার এত ভেদ, তখন কোটি কোটি দিব্য বর্ষে যে কত ভেদ হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বস্তুতঃ আমি বহু বহু ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছি, কিন্তু কোথাও দুই বস্তুকে সম্পূর্ণ সমান দেখি নাই, ইহা আমার বেশ ধারণা আছে। তবে প্রণব প্রভৃতি কয়েকটী শব্দ এ কল্পে জাতিস্মর পুরুষদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উহা পূর্ব্বেও ছিল।

এক বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে। তাহাদেরও বহু লইয়া আর এক বৃহৎ লোক থাকিবে। এইরূপে ওদিকেও অসীম। আবার এই সমস্তের অনাগত ও অতীত অবস্থা লইলে সেদিকেও অসীম। সার্ব্বজ্ঞ্যেরও অর্থ বুঝিলাম। বস্তুতঃ নিঃশেষরূপে জানার নাম সার্ব্বজ্ঞ্য নহে। কারণ, কেহ যদি জানিতে থাকে তবে, তাহার প্রতিমুহূর্ত্তের জ্ঞেয় বিষয় যতই বৃহৎ হউক না, তাহা কখনও অসীম জ্ঞেয় বিষয়কে অতিক্রম করিতে পারিবে না। কারণ, সসীমের সমষ্টি করিতে থাকিলে কখনও তাহা অসীম হইতে পারে না। আর, সমস্ত দ্বৈত-জ্ঞানই সসীম। ফলতঃ সার্ব্বজ্ঞ্যের অর্থ জ্ঞানের কোন রোধক হেতু (এতটা জানিতে পারিব, তদুপরি আর পারিব না) না থাকা। আরও বুঝিলাম, জ্ঞেয় অসীম হওয়াতেই যোগিগণ সার্ব্বজ্ঞ্যকেও তুচ্ছ জানিয়া কৈবল্য-রূপ পরম পদ আশ্রয় করেন। বাহ্যের মত কৈবল্যের ক্ষয় ও অতিশয় (অর্থাৎ তদপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা) নাই।

একবার সাধারণ মানব, যাহারা কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে রত, তাহাদের সহিত যোগীদের প্রজ্ঞা-বিষয়ক তুলনা আসিল। মনে হইল, একজাতীয় হইলেও মানবে মানবে যে কত প্রভেদ হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই!

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাহ্য-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকরণ।

ইহার পর আমি 'তত্ত্ব-দর্শন আগারে' বসিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহা 'দিব্য-দৃষ্টি আগারের' সর্ব্বৈব তুল্য, কেবল ভিত্তি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ। ইহাতে প্রত্যহই বসা যায়। দুই দিন মাত্র নূতন

নূতন তত্ত্ব দর্শন হয়, শেষে পূর্ব্বদৃষ্ট চরম তত্ত্বেরই দর্শন হইতে থাকে। বসিবার পরই কিছুক্ষণ মাত্র তত্ত্ব সাক্ষাৎ হইয়া শেষে সাধারণ জ্ঞান আসে, আর সে দিন কিছু হয় না।

আন্তর ও বাহ্য সমস্ত পদার্থ যে কয়েকপ্রকার মূল পদার্থে বিভক্ত করা যায়, তাহাদের নাম তত্ত্ব। তত্ত্ব সকল স্থূলতঃ তিনপ্রকার—গ্রাহ্য-তত্ত্ব, গ্রহণতত্ত্ব ও গ্রহীতৃতত্ত্ব। তন্মধ্যে এখানে ভূত ও তন্মাত্র নামক দুইপ্রকার গ্রাহ্যতত্ত্ব এবং বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ নামক দুই-প্রকার গ্রহণতত্ত্ব দুই দিনে সাক্ষাৎ হয়। স্বরূপগ্রহীতৃতত্ত্ব বা পুরুষ-তত্ত্ব বিবেকখ্যাতিরও নিরোধ হইলে তবে উপলব্ধ হয় বলিয়া (সুতরাং সর্ব্বপ্রকার বাহ্য-প্রভাবের অসাধ্য বলিয়া) এখানে বোধ হয় তাহার সাক্ষাৎকার হয় না ; অন্ততঃ আমার হয় নাই।

এই তত্ত্বদর্শন যোগীদের পক্ষেও সূক্ষ্ম বিষয়, সুতরাং সাধারণে ইহা তত বুঝিতে পারিবে না। তথাপি আমার বক্তব্য বিষয়কে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার জন্য ইহার কিছু বলিতেছি।

প্রথমতঃ তত্ত্ব-দর্শন আগারে বসিবামাত্র পূর্ব্বের মত সমাধি-ভাব আসিয়া চিত্ত নাসাগ্রে বিনিবদ্ধ হইল। তাহাতে প্রথমতঃ অনেক অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব গন্ধানুভব হইয়া পরে চিত্ত গন্ধ-গ্রহণ-বিষয়ে এত নিশ্চলভাবে অবহিত হইল যে, আমি নাসিকাস্থ শারীর ধাতুরও গন্ধ (যাহা সাধারণতঃ মোটেই বোধগম্য হয় না) পাইতে লাগিলাম। তাহাতেই চিত্ত এত স্থির হইয়া গেল যে, আমি আত্ম-হারা হইয়া ও অন্য সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইয়া কেবল সেই গন্ধকেই জানিতে লাগিলাম। তখন বোধ হইল, কেবল সেই গন্ধময় সত্তাই জগতে বিদ্যমান আছে। পরে সেই ভাব শিথিল হওয়াতে রসের বিষয় মনে আসিল। তখন চিত্ত জিহ্বাগ্রে বিনিবদ্ধ হইয়া রসগ্রহণে পূর্ব্ববৎ সুনিশ্চল ভাব ধারণ করাতে জিহ্বার অবসেচক

জ্বালার স্বাদ স্ফুটরূপে জ্ঞানগম্য হইল। পরে পূর্ব্বের ন্যায় কেবল সেই রসের সত্তামাত্রই নির্ভাসিত হইতে লাগিল।

তৎপরে চক্ষুর্গত যে সাংস্কারিক জ্যোতি (Entoptic photism) দর্শন হয়, তাহাতে চিত্ত সমাহিত হইয়া কেবলমাত্র তাহারই সত্তা নির্ভাসিত হইতে লাগিল। তৎপরে সেই সময়ে যে আশীতল স্পর্শজ্ঞান হইতেছিল, তাহাতে সমাধান হইয়া জগৎ কেবল তাহারই সত্তাময় বলিয়া বিভাত হইল। পরে কর্ণাভ্যন্তরের রক্তাদি চলাচল হেতু যে নানাবিধ নাদ (যাহাকে অনাহত নাদ বলে) শুনা যায়, তাহার একপ্রকার শব্দে (চিঞ্চিনী এইরূপ) চিত্ত সমাহিত হইল। তখন আমি রূপরসাদি সমস্ত জ্ঞান সম্যক্‌রূপে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র যেন ব্যাপ্তিহীন সেই "চিঞ্চিনী"-শব্দময় অনাবৃত সত্তা কালধারাক্রমে বোধ করিতে লাগিলাম।

এইরূপে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ নামক পঞ্চভূতের তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিলাম। আমি কোন বিশেষ বাহ্য শব্দাদিতে সমাধি করি নাই বলিয়া শরীরের সাহজিক শব্দাদিতেই আমার সমাধি হইয়াছিল।

শব্দতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হওয়ার পরে আবার সেই শব্দকে বিষয় করিয়া প্রগাঢ়তর চিত্তস্থৈর্য্য হইতে লাগিল। যেমন কোন সূক্ষ্ম শব্দ শুনিতে গেলে স্থিরভাবে অবহিত হইতে হয়, সেইরূপ অধিকাধিক স্থৈর্য্য সহকারে সেই ধ্যেয় শব্দে অবহিত হইয়া, তাহার বহুবিধ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা গোচর হওত শেষে এরূপ এক সূক্ষ্ম অবস্থায় গেল যে, তদপেক্ষা আরও স্থির হইলে শব্দজ্ঞান একবারে বিলুপ্ত হয়। সেই পরম-সূক্ষ্ম শব্দ একাকার সর্ব্বভেদ-রহিত কেবল যেন শ্রবণমাত্রযোগ্য। আর তাহা শুনিয়া সাধারণ শব্দজ্ঞানের ন্যায় সুখী, দুঃখী বা মূঢ় হইতে হয় না। পরে ঠিক এই প্রণালীতে

অসংখ্যপ্রকার স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের চরম সূক্ষ্ম একাকার ভাব বা স্পর্শমাত্র, রূপমাত্র, রসমাত্র ও গন্ধমাত্র সাক্ষাৎ করিলাম।

ইহার পর সাধারণ জ্ঞান আসিল। আমি সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাব স্মরণ পূর্ব্বক বিভোর হইয়া কতকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পরে আর কিছু না হওয়াতে শিথিল-গতিতে আসিয়া মনন-মঞ্চে শয়ন করিলাম। তখন তত্ত্বদর্শনের গৌরব ও মোক্ষের পক্ষে উপাদেয়তা হৃদয়ঙ্গম হইল। বুঝিলাম, পূর্ব্বে যে অসীম-বৈচিত্র্যযুক্ত বহু বহু ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছি, তাহারা সমস্তই এই কয়েকটী তত্ত্বের অন্তর্গত। আরও বুঝিলাম, এইরূপে জগৎকে দেখিতে শিখিলে 'নামরূপ' বা ব্যবহারিক মোহ সম্যক্ অপগত হয় এবং বাহ্য কোন বস্তুতে আর সুখ, দুঃখ বা মোহ থাকে না। তথায় শয়ন করিয়া 'তত্ত্ব-দৃষ্টি' এক এক বার স্মরণ হইতে লাগিল এবং তদ্দৃষ্টিতে কোন কোন বিষয় এক এক বার যেন দেখিতে লাগিলাম। তখন কোন প্রিয়জনকে মনে পড়াতে তাহার রূপের দিকেই তন্ময় ভাব আসিতে লাগিল, তাহাতে কেবল চক্ষুর্গ্রাহ্য এক আকার মাত্রই বোধ হইতে লাগিল। অন্য যে সমস্ত গুণের জন্য 'প্রিয়জন' বলিয়া ব্যবহার করিতাম ও তাঁহার প্রতি ভালবাসা প্রভৃতির দ্বারা যে মুগ্ধ হইতাম, তাহা ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম। গুণ সকল রূপ হইতে বিশ্লিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সেইরূপ কোন পদ (বাচক) মনে হইলে তাহার ধ্বনির দিকে মন একাগ্র হইতে লাগিল, আর তাহার অর্থজ্ঞান (বাচ্য) বিশ্লিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মনে করিলাম, এরূপে যদি নিয়ত দেখা যায়, তবে এই ব্যবহারিক জগৎ মরীচিকার ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আমরা প্রয়োজন বা স্বদৃষ্টি-অনুসারে কোন এক দ্রব্যের কতকগুলি ধর্ম্ম দেখিয়া তাহার 'নাম' রাখি অথবা সেই দ্রব্য চিনিয়া রাখি। সেই নাম অথবা 'চেনার' সঙ্গে সঙ্গে শব্দ, স্পর্শ,

রূপ, রস, গন্ধ এবং নানাবিধ ক্রিয়ার সঙ্কীর্ণ ধারণা হয়। প্রয়োজনের ও দৃষ্টির ভেদে একই দ্রব্য ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, এক শিলা-পুত্র অস্ত্র, লোড়া, দেববিগ্রহ প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক 'নাম,' অথবা নাম না থাকিলে 'চেনার' সহিত আমাদের নানা সংকীর্ণ গুণের জ্ঞান আসে। তাহাতে আমরা ব্যবহারিক জগৎকে সত্যবৎ বিবেচনা করিয়া তাহাতে সুখী, দুঃখী ও মূঢ় হই। কিন্তু ব্যবহারিক দ্রব্যের শব্দাদি গুণ যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে (চঞ্চল চিত্তের দ্বারা যেরূপ সংকীর্ণভাবে গ্রাহ্য হয় সেরূপ নহে) উপলব্ধ হয়, তবে আর ব্যবহারিক ভাব থাকে না। তখন আমরা বাহ্যকে প্রকৃতরূপে সুখ-দুঃখ-শূন্য বা নিরর্থক দেখিতে পারি। এইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞান যে বিমুক্তির পক্ষে কতদূর উপাদেয় তাহা বুঝিলাম; কিন্তু আমার একাগ্রভূমিকা কেবল অল্পমাত্র আয়ত্ত হওয়াতে ঐ তত্ত্বভাব বহুক্ষণ থাকিত না; বিক্ষেপের দ্বারা তাহা বিপ্লুত লইয়া যাইত। একাগ্রভূমিক চিত্তে এইপ্রকার তত্ত্বজ্ঞান আসিলে তাহাকেই সম্প্র-জ্ঞাত যোগ বলে এবং তাহাই মুক্তির গৌণ হেতু।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আন্তর-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকরণ।

ইহার কয়েক দিন পরে আমি পুনরায় তথায় বসিলাম। এবার গ্রহণ-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইল। গ্রহণ বা করণ অর্থে যে সমস্ত শক্তির দ্বারা আমাদের জ্ঞান, কার্য্য, দেহ-ধারণ ও চিন্তন সিদ্ধ হয়, সেই শক্তি-সমূহ। এ বিষয় পূর্ব্বাপেক্ষাও দুরূহ। তজ্জন্য স্থূলভাবে লিখিতেছি। সে দিন একবারেই তন্মাত্রতত্ত্ব সাক্ষাৎ হইল। তাহাতে কিছু-ক্ষণ স্থির থাকাতে বাহ্য পদার্থ নিরর্থক বা আকর্ষণশূন্য বোধ হইয়া

অবধানবৃত্তি ইন্দ্রিয়শক্তির দিকে আসিল। তখন ক্রমশঃ বোধ হইল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, সমস্তই ক্রিয়াস্বরূপ ও তাহারা আমার ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করিতেছে। সেই ক্রিয়া বা চাঞ্চল্য, জ্ঞানময় বা জ্ঞাতা আমিত্বে যাইয়া শব্দাদি-রূপে বোধগম্য হইতেছে। এইরূপে শব্দাদিকে ক্রিয়াস্বরূপ এবং তন্নির্ম্মিত ও তদ্ব্যবহারকারী শরীরেন্দ্রিয়কে (রক্ত, মাংস, অস্থি, স্নায়ু প্রভৃতিকে) কাঠিন্য-তারল্যাদি-শূন্য কেবল ক্রিয়াময় বোধ হইল। যেমন চুম্বক স্বীয় শক্তির দ্বারা লৌহ-চূর্ণকে আকর্ষণ করিয়া রাখে, সেইরূপ বোধ হইল যেন আমি অভিমানের দ্বারা শরীররূপ ক্রিয়াসমষ্টিকে ধরিয়া রহিয়াছি। সেই ক্রিয়াসমষ্টি সর্ব্বদাই তদ্ধারক অভিমানকে সক্রিয় করিতেছে। তাহাতে আমার জ্ঞান, কার্য্য ও দেহ-ধারণ-রূপ অস্মিতা হইতেছে।

যে শরীরকে ও বাহ্যদ্রব্যকে পূর্ব্বে অত্যন্ত স্থিতিশীল বলিয়া বোধ হইত ও যাহা আমার অদ্বিতীয় আশ্রয় বলিয়া বোধ হইত, তাহা তখন নিতান্তই অলীক ক্রিয়াপ্রবাহস্বরূপ বোধ হইল। বোধ হইল যেন আমি শূন্যে অবস্থিত। এইরূপে বাহ্যেন্দ্রিয়তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইল।

তৎপরে সমস্ত শরীরেন্দ্রিয়ের মধ্যগত, তাহাদের ধারক আত্মলীন অভিমানের দিকে চিত্ত যাইল। তখন আর বিস্তারযুক্ত দেশ-বোধ রহিল না, কেবল বোধ হইল যেন চঞ্চল ক্রিয়াপ্রবাহ ক্ষণের পর ক্ষণে চলিয়া যাইতেছে। তখন তাদৃশ ক্ষণপ্রবাহ বা কালকেই একমাত্র অধিকরণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

পরে চিত্ত আরও স্থির এবং অন্তরাভিমুখ হইয়া সেই অভিমানের যাহা মূল উৎস, সেই বোধরূপ জ্ঞাতৃত্বভাবে যাইয়া অবস্থিত হইল। কোন মনুষ্য যদি অত্যুচ্চ স্থান হইতে পতিত হইতে থাকে, তখন তাহার যেরূপ বোধ হয়, বাহ্যেন্দ্রিয়-তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া বাহ্যের

আধারত্ব-মোহ অপগত হইলে, আমার সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। পরে সেই পতনশীল ব্যক্তি যদি শূন্যেই কোন কোমল সুখস্পর্শ দ্রব্যের বা শক্তির দ্বারা বিনা উপঘাতে সম্যক্ রুদ্ধগতি ও স্থৈর্য্য লাভ করে, তখন তাহার যেমন বোধ হয়, সেই জ্ঞাতৃত্ব বা 'আমি'-ভাবে স্থিত হওয়াতে তদ্রূপ বিশোক, অভয় স্থির-স্থিতির বোধ হইল। বাহ্য সমস্ত আধার শূন্যবৎ, তাহাই একমাত্র অচল আধার ও সর্ব্বাভীষ্টতার একমাত্র আস্পদ ও বোধের একমাত্র উৎস বলিয়া বোধ হইল। এইরূপে অন্তঃকরণের বা বুদ্ধি-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইল। কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, তাহা বাহ্যের জ্ঞাতা বলিয়া অনাত্ম-উদ্রেকের দ্বারা অনুবিদ্ধ। আমি অভিমানকে আশ্রয় করিয়া সেই ভাবে গিয়াছিলাম। যদিও অবধান সেই আমিত্বের দিকে ছিল, কিন্তু সেই অভিমানের 'মূল আমি' বা 'দৃশ্যের জ্ঞাতা আমি' এইরূপ অস্ফুট বাহ্য বোধের উপমায় সেই আমিত্ব স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল। বুঝিলাম, যদি সেই বাহ্য উদ্রেকও না থাকিত, যদি সমস্ত অনাত্ম-বোধের সম্যক্ নিরোধ হইত, তবেই **কৈবল্যপদের** বা **পুরুষ তত্ত্বের অনুভাব** হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই এবং এ পর্য্যন্ত করিতেও পারি নাই।

গ্রহণ-তত্ত্ব-সাক্ষাতের পর, আমি পুনরায় মনন-মঞ্চে আসিলাম। তথায় সেই মহান্ ভাব সকল অনুস্মরণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেশ বা বিস্তার-জ্ঞান কিরূপ মোহ ও সেই মোহ কিরূপে দূর হয়, তাহা বুঝিলাম। ঋঙ্মন্ত্রে পড়িয়াছিলাম 'ভুব আশা অজায়ন্ত', অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানের সহিত আশা বা দিকের জ্ঞান ও দেশের জ্ঞান জন্মে। ইহার তত্ত্ব এখন বুঝিলাম। বাহ্য ভাব ছাড়িয়া আন্তর ক্রিয়াময় ভাবে অবস্থিতি করিলে আর দেশজ্ঞান থাকে না। তখন সত্তা কালাধার বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। আবার সেই আন্তর ক্রিয়াও

রুদ্ধ হইলে যে কালের জ্ঞানও থাকিবে না, তাহাও বুঝিলাম। বুঝিলাম, সেই পরা চিতিশক্তি কিরূপে দেশ ও কালের অতীত। কিরূপে দেশ-কাল-শূন্য চিৎ ও অব্যক্ত হইতে অপর সমস্তের ন্যায় দেশ ও কাল-রূপ মোহ উৎপন্ন হয়, তাহাও বুঝিলাম। অহো! লোকের কি অজ্ঞতা! তাহারা দেশ কালকে পরমা শক্তির আধার মনে করে!!! মনে করে চৈতন্য সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়া আছে'—'সর্ব্বত্র তার সত্তা' ইত্যাদি!

এইরূপে আমি ঋদ্ধি-মন্দিরের প্রায় সমস্তই দেখিলাম। তৃতীয় স্তবকে যাইতে আমি আর একদিন চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। কারণ নিরোধ-সমাধি না হইলে তথায় যাওয়া যায় না। নিরোধ-সমাধির ত কথাই নাই, সবীজ সমাধিও আমার অভ্যস্ত হয় নাই।

ঋদ্ধি-মন্দিরের উদ্দেশ্য আমি এইরূপ অবধারণ করিয়াছিলাম—তথাকার প্রভাবে কিছু কালের জন্য সাধনের উচ্চ ও নিগূঢ় বিষয়ের যথাযথ অনুভাব হয় মাত্র। পরে সাধক যদি বাহ্য বিষয়ে বিরক্ত হইয়া সেই অনুভাবপূর্ব্বক তদ্বিষয় নিরন্তর অভ্যাস করিয়া আয়ত্ত করে, তবে কৃতকৃত্য হইতে পারে। সাধকদের ইহাতে অত্যন্ত সহায়তা হইতে পারে। উত্তর দিকে যে রাষ্ট্রিক বিভাগ ছিল, তাহারও তত্ত্ব আমি ইহা হইতে অনুমানে বুঝিলাম। রাষ্ট্রকার্য্য-কারিগণ তথাকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে রাজ্যশাসনের পদসমূহের উপযোগী হইতে পারে। এইরূপে এখানকার পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি-গণ যদি পৃথিবীর রাষ্ট্রিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ের নেতা হইত, যদি অত্রলভ্য প্রজ্ঞা ও আত্মসংযম পৃথিবীর অদ্বিতীয় আদর্শ হইত, তবে অযোগ্য ব্যক্তির উচ্চ-পদ-লাভের ও অজ্ঞানের জন্য মানব-সমাজে যে অশেষবিধ দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা হইত না। যোগিবর অশ্বজিৎ যদি পৃথিবীকে ইহার অধীন করিয়া তাহার পরম্পরা চালাইয়া যাইতেন,

তবে পৃথিবীতে মানবগণ একপরিবারভুক্ত হইয়া সুখ-শান্তিতে থাকিত। কিন্তু তাহা হইলে আর এক মহাদোষ হইত। পৃথিবীতে অপুণ্যকারীদের স্থান হইত না। তাহারা এখানে আসিয়া নানা দুঃখে পীড়িত হইয়া যে পরমার্থ-বিষয়ে অভিমুখ হয়, তাহা হইত না। বাহ্যের সুখে থাকিয়া প্রায় লোকেই আন্তর বিষয়ে রুচিযুক্ত হইত না। ফলতঃ পৃথিবী দুঃখবহুল হওয়াতে, বাহ্যসুখাকাঙ্ক্ষীরা দুঃখ-ভয়ে যে সংজ্ঞালাভ করে, তাহা ঘটিত না। ইহা বুঝিয়া বোধ হয় প্রথমতঃ দয়াপরবশ হইয়া অশ্বজিৎ যোগী যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পরে সে সংকল্প ত্যাগ করিয়া স্বয়ং নির্ব্বাণমার্গে নিবিষ্ট হন। বস্তুতঃ জগতের আমূল সংস্কারের সুবৃহৎ কল্পনা করা একপ্রকার ভ্রান্তি।

এই সময় আমার এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এই সমস্ত অলৌকিক বিষয় দেখিয়া একদিন মনে হইল, ইহা লোকসমাজে প্রচার করিব। কিন্তু মনে মনে বুঝিলাম, উহা আমার বিঘ্ন। তথাপি তাহা প্রায়ই মনে আসিয়া মনকে বিক্ষিপ্ত করিত। আর সেই সময়ে পুনরায় শ্রাবণ মাস আসাতে মনে হইল, এই সময়, না যাইলে আর এক বৎসরের মধ্যে যাইতে পারিব না। এইরূপে ঐ সব কথা প্রকাশ করিবার জন্য মন বড়ই ব্যস্ত হইল। প্রতিবাসীর দোষ জানিলে তাহা প্রচার করিবার জন্য মজলিসী স্ত্রীলোকদের যেমন পেটের মধ্যে কল্ বল্ করে, আমারও তদ্রূপ অবস্থা বা দুরবস্থা হইল।

মন অধিক চঞ্চল হওয়াতে আমি তথা হইতে লোকালয়ে আসাই স্থির করিলাম। পাঠককে প্রত্যাবর্ত্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বলিয়া আর বিরক্ত করিব না। সেই স্থান হইতে বহুকষ্টে সেই প্রস্তরের ফাট দিয়া উপরে চড়িয়া, পূর্ব্বদৃষ্ট যে বাদাম ও অক্ষোটের বৃক্ষ ছিল, তাহার ফল সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাই পাথেয় করিয়া, প্রত্যাবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বকার সেই পথে শত শত বার প্রাণসঙ্কট হইতে রক্ষা

পাইয়া, শেষে যে তুষারক্ষেত্র হইতে আমি গড়াইয়া নামিয়াছিলাম, তাহার নিকট আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম, তাহা গলিয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; কারণ তাহা উপর হইতে বিচ্যুত হইয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ উপত্যকায় পতিত হইয়াছিল বা নাবিয়া আসিয়াছিল। ইহাতে আমার ফিরিবার সুবিধা হইয়াছিল। তবে পূর্ব্বকার সেই গিরিসঙ্কটে হিমবাত্যার (Blizzard) মধ্যে পতিত হইয়া আমার শীতান্ধতা বা Snow-Blindness হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অনেক কষ্টে তাহা হইতে রক্ষা পাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

এইরূপে আমি যখন লোকালয়ে পৌঁছিলাম, তখন গঙ্গোত্তরী, বদরীনারায়ণ প্রভৃতি তীর্থ হইতে সমস্ত লোকই নিম্নতর গ্রামে আসিয়াছে। আমিও ত্বরা করিয়া পাহাড় অতিক্রমপূর্ব্বক হরিদ্বারে আসিলাম।

এস্থলে আর একটী কথা পাঠককে জানাইতেছি। দিব্য-দৃষ্টির দ্বারা প্রথমেই আমি এক কটাক্ষে ঋদ্ধি-মন্দিরের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম। তাহাতে জানিয়াছিলাম, উহা স্বাভাবিক নিয়মবশে চলিতেছে। উহার কোন চেতন অধিষ্ঠাতা পুরুষ নাই। অশ্বজিৎ যোগী জড়শক্তি সকলকে এরূপ কৌশলে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, কল্পান্ত পর্য্যন্ত তাহা স্বতই চলিবে। আহার্য্যের উপাদানভূত নানাবিধ ধাতব লবণাদিমিশ্রিত এক ঈষদুষ্ণ প্রস্রবণের জল এবং নির্ম্মাতার অলৌকিক-প্রজ্ঞা নির্ব্বাচিত জীবাণু-বিশেষ হইতে তথাকার আহার্য্য উৎপন্ন হয়। সেই কুণ্ডগাত্র হইতে বিকীর্ণ শক্তিবিশেষ দ্বারা বোধ

হয়, অজৈব প্রস্রবণবারি হইতে প্রথমে কোন প্রকার অস্ফুট প্রাণী উৎপন্ন হয়; তদ্দ্বারা বোধ হয় উক্ত জীবাণু অনুজীবিত থাকে। নির্ম্মল সলিলের প্রস্রবণ হইতে তথাকার অন্য সব জল আসে।

তদ্ব্যতীত নানাপ্রকারের বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য শক্তির দ্বারা সেখানকার সমস্ত প্রয়োজন নির্ব্বাহিত হয়। পূর্ব্বেই সেখানকার প্রস্তরময় প্রাঙ্গণের স্বাভাবিক উষ্ণতা ও আলোক বিকিরণের কথা বলিয়াছি। বোধ হয়, তাহা দ্বারা কোনপ্রকার জীবাণু বা Microbe উৎপন্ন হইতে না পাওয়াতে সে স্থান অনেক পরিমাণে নীরোগ ছিল। আমি প্রথমে যে রুটি লইয়া গিয়াছিলাম, তাহার কয়েকখানা অবশিষ্ট ছিল; তাহা আমি এক স্থানে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। উহা বহুদিন অবিকৃত ছিল এবং শেষে একপ্রকারে বিকৃত হইলেও কখন পচিয়া যায় নাই। ইহাতেই আমি উপরোক্ত বিষয় বুঝিয়াছিলাম; কারণ পূতিভাব যে জীবাণুর দ্বারা সংঘটিত হয় তাহা আমি জানিতাম।

লোকালয়ে আসিয়াই আমি আমার প্রত্যাবর্ত্তনের অবিমৃষ্যকারিতা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কারণ, এই সব বিষয় জানাইবার প্রকৃত অধিকারী পাওয়া দুর্লভ। প্রায় সকল লোকেই বিষয়প্রমাদবশতঃ এই সব পারমার্থিক ও কঠোর-সাধনসাধ্য বিষয়ের আলোচনায় পরাঙ্মুখ। সুতরাং আমি বলিবার প্রকৃত অধিকারী পাইতাম না। পরে মনে করিলাম, আমার গুরুদেবের নিকট সমস্ত নিবেদন করিব। কিন্তু তিনি নীলগিরিতে আছেন কি না তাহা জানিবার জন্য পত্র লেখাতে, তাহার কোন উত্তর পাইলাম না। পুনশ্চ ততদূর পদব্রজে যাইয়া তাঁহার সন্ধান করিতেও সহসা প্রবৃত্তি হইল না।

ইহার পর কিছু দিন লোকালয়ে ঘুরিলাম। কিন্তু সেই স্থান ত্যাগের জন্য সর্ব্বদাই অনুতপ্ত থাকিতাম। মনে করিতাম, তাদৃশ পরম অনুকূল সাধনার স্থানকে ত্যাগ করিয়া কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি।

পরে আমি পুনরায় তথায় যাইবার জন্য সঙ্কল্প করিলাম। মনে করিলাম, যদি প্রাণপণ করিয়া তথায় যাইতে পারি, তবে আর কখন ফিরিব না। ইতি।

পুনশ্চ। আমি তথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম বটে, কিন্তু সেই স্থানের সবিশেষ পথের পরিচয় দিলাম না। কারণ কিছু দিন পূর্ব্বে যেমন "সিদ্ধাশ্রমের" হুজুগে পড়িয়া কেহ কেহ ঠকিয়াছিলেন, তেমনি হয় ত কেহ এই হুজুগে পড়িয়া সেই অতি দুর্গম স্থানে গমন করিতে যাইয়া শেষে প্রাণ হারাইবেন, এবং আমাকেই সেই পাপের দায়ী হইতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি এক সাধুদের আশ্রমে ইহা ফেলিয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলাম। যদি কেহ ইহা কুড়াইয়া পান এবং এই শেষ পৃষ্ঠ প্রথমে তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়ে তবে অনুরোধ একবার পড়িয়া দেখিবেন।